প্রথম প্রকাশ : অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬৭

প্রচ্ছদপট : শ্রীগণেশ বসু
ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফোটো এন্‌গ্রেভিং কোং
মুদ্রণ : চয়নিকা প্রেস প্রাইভেট লিঃ
গ্রন্থন : মোসলেম্ খান এণ্ড ব্রাদার্স

তিন টাকা

সুরভি প্রকাশনীর পক্ষে শ্রীসরোজবরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত
এবং শ্রীবিভাসকুমার গুহঠাকুরতা কর্তৃক ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস,
৯/৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত।

আমার প্রথম গল্পের প্রথম পাঠিকা

মা-কে

উপন্যাসটি 'জলরং' নামে বসুধারা পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

—লেখক

"কাহারে পরাব রাখী যৌবনের রাখীপূর্ণিমায়"
—রবীন্দ্রনাথ

চোখ-দুটো রগ্‌ড়ে নিয়ে ছোট্ট একটা হাই তুলতে তুলতে জানলা দিয়ে অলস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকাল শম্পা। ওমা, বেশ ফরসা হয়ে গেছে। কী স্টেশান এল এটা? জনকয়েক চাষী তরি-তরকারী-ভর্তি ঝাঁকা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট্ট প্ল্যাট্‌ফরমের সবুজ রেলিং-এর ওপাশে খাবারের দোকানগুলোতে আঁচ পড়েছে। বাতি-নেভা ইলেক্‌ট্রিক পোস্টের নীচে সবুজ রঙের কয়েকটা বাস্‌ দাঁড়িয়ে। একজন কণ্ডাক্টার ভাঁড়ে করে চা খেতে খেতে যাত্রী সংগ্রহের জন্য চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। তাহলে তো প্রায় এসে গেছে। কাপড়টা গুছিয়ে নিল শম্পা। ইস্‌! কতো কয়লার গুঁড়ো! এলোমেলো চুলগুলোকে শায়েস্তা করে, খোঁপাটাকে আলগোছে একটু ঠিক করে নিল। আড়চোখে একবার দেখে নিল ওপাশের বাঙ্কের ওপর রাখা অমরেশের দেওয়া স্যুটকেস আর সাজিটা। মালপত্র বলতে এই। ভাঁড়ে করে একটু চা খেয়ে নেবে নাকি? না, থাক্‌, মুখ-টুখ ধোয়া নেই। একেবারে বাড়ী পৌঁছে খাওয়া যাবে। আর যদি হাওড়া স্টেশানে অমরেশ আসে তাহলে—

অমরেশ কি স্টেশানে আসতে পারে? শম্পা ভাবতে চেষ্টা করলো। শম্পা অবশ্য চিঠি একটা দিয়েছে। কিন্তু অমরেশ কার্সিয়াং থেকে ফিরেছে কিনা কে জানে। মে মাস পড়তে না পড়তেই অমরেশের কলকাতা থেকে ওপরের দিকে চলে যাওয়া চাই। মে মাসের গরমে কলকাতা নাকি ওর পক্ষে অসহ্য। শীতাতপ বোধটা প্রখর সন্দেহ নেই। তবে পৈতৃক ব্যবসা, বাড়ী-ভাড়ার আয় ইত্যাদিগুলো এ-বোধটাকে কতখানি প্রশ্রয় দিয়েছে, শম্পা একদিন মুচকি হেসে অমরেশকে জিগেস করেছিল। অমরেশ হেসে এড়িয়ে গিয়েছিল কথাটা। বলেছিল, সব সঞ্চয় শেষ করে দিতে পারলে শম্পার ছেলের পক্ষেই তো ভালো। তাকে আর ডেথ-ডিউটি দিতে হবে না। কী অসভ্য! হঠাৎ কথাটা মনে হওয়ায় ট্রেনের কামরায় বসে শম্পার কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগল।

বেলিলিয়াস পার্ক, বামুনগাছি পেরিয়ে বাঙালবাবুর পোলের তলা দিয়ে ট্রেনটা সাপের মতো এঁকে-বেঁকে বাকৃল্যাণ্ড ব্রীজের কাছে একটু থামল। শম্পা

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে একটু হাত-পা ছাড়িয়েছে। বাঙ্ক থেকে সাজিটা নামিয়েছে। বেশ ভারী আছে। মা কাকীমার জন্য দিয়েছে বড়ি, আচার, আর কাজুবাদাম। তা ছাড়া ওদের ওখানে কাজুবাদাম দিয়ে একরকম সন্দেশ তৈরি হয়। তাও কিছুটা আছে। ও-বাড়ীর কাকীমা, মানে অরূপের মায়ের ফরমাস ছিল, সন্দেশ আর কাজুবাদাম। বাদলের ফরমাস কাজুবাদাম। আর ও নিজে অমরেশের জন্য নিয়েছে কাজুবাদামের সন্দেশ। স্যুটকেসটা ভারী হয়েছে বইগুলোর জন্যে। বাড়ী যাবার সময়ে ক্লাসের বইগুলো নিয়ে গিয়েছিল। গরমের ছুটিতে পড়বে বলে। কিচ্ছু পড়াশোনা হয়নি। শুধু ক্যাল্‌কুলাস আর কো-অর্ডিনেট্ জিওমেট্রির কিছু অঙ্ক করেছে। অথচ হোল্ ইন্-অরগ্যানিক কেমিস্ট্রিটা! ফোর্থ্-ইয়ারে যে কি হবে!

ট্রেনটা আবার নড়ে উঠল। বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজ পেরোতেই হাওড়া স্টেশানের প্ল্যাট্‌ফরম। কত নম্বরে দিল? অমরেশ কি আসবে? জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ল শম্পা। একটু উদ্বেগ, একটু প্রতীক্ষা। কুলীগুলো দৌড়ে দৌড়ে কামরায় উঠে পড়ছে। বলা-কওয়ার অপেক্ষায় না থেকে, মালপত্র টানাটানি করছে। এত ভোরেও প্ল্যাট্‌ফরমে লোক গিজ গিজ করছে। ডাকবে নাকি একটা কুলী? আরে, ঐ তো!

"এই!" শম্পা অজ্ঞাতসারেই ডাকল।

অমরেশ দেখতে পেয়ে হাসলো। হাত নাড়লো।

প্ল্যাট্‌ফরম থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। পেছনে কুলীর মাথায় স্যুটকেস আর সাজি।

"এত ভোরে বাড়ী গিয়ে কি করবে? কেউ তো ওঠেনি এখনও। তোমাকেই হয়তো গিয়ে চা করতে বসতে হবে।"

"যা বলেছ।"

"তার চেয়ে চল, একটু চা খাওয়া যাক।"

কুলীকে ছেড়ে দিয়ে ওরা এলো স্টেশানের কফি-কর্নারে। হাত-মুখ ধুয়ে এলো শম্পা। একটা টেবিল নিয়ে দুজনে বসল। বিশেষ ভীড় নেই। বয় এসে দাঁড়াতেই অমরেশ অর্ডার দিয়ে দিল—টোস্ট্, ওম্‌লেট, চা।

"খিদে পেয়ে গেছে।" অমরেশ বলল।

"কেন, খেয়ে বেরোওনি ?"

"না। ভাবলুম, অনেকদিন পর আজ দুজনে মিলে একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে।"

"বাপ রে, কী প্রতীক্ষা !"

"তারপর ! গরমের ছুটিটা কাটল কেমন ?"

"ছাই। যা গরম, শেষের দিকে তবু দু'চারদিন বৃষ্টি পড়েছিল। কিচ্ছু পড়াশোনা হয়নি।"

"বললাম, এই গরমে চল আমার সঙ্গে কার্সিয়াং।" অনুযোগ করল অমরেশ।

"যা ! তা কখনো হয় ?"

"হয়না কেন ?" ঈষৎ ক্ষুব্ধ শোনাল অমরেশের কণ্ঠস্বর, "তোমার ইচ্ছে থাকলেই হ'ত।"

আশ্চর্য ! অমরেশ কি এখনো তাই ভেবে বসে আছে নাকি ?

গরমের ছুটি পড়ার আগে অমরেশ অনেকবার বলেছিল অবশ্য, ওর সঙ্গে কার্সিয়াং যেতে। কিন্তু বাড়ীতে কী বলবে ? অমরেশ যে ওকে বিয়ে করতে চায়, তাই এখনও বাড়ীতে জানে না। আর জানলেই বা কি ! বিয়ের আগে এইরকম ভাবে বেড়াতে গেলে কী ভাবত সবাই। অমরেশ পরামর্শ দিয়েছিল, বাড়ীতে জানিয়ে দাও, কার্সিয়াং-এ এক বন্ধুর বাড়ী যাচ্ছি। আর কলকাতায় কাকীমাদের কাছে বলে দাও, বাড়ী যাচ্ছি। বাস্ ! শম্পার ভুল হয়েছিল, অমরেশের প্রস্তাবটা নিয়ে দু'একবার মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করেছিল। তাই অমরেশ ধরে নিয়েছে যে সে ইচ্ছে করলে নাকি ওর সঙ্গে যেতে পারত। অবশ্য শম্পা যদি ওর সঙ্গে যেত তাহলে বাড়ীতে যার যা খুশি ভাবুক, বাধা তাকে কেউ দিতে পারত না। তবে ওরকম ভাবে গোপনতার আশ্রয় নিয়ে কিছু করতে ওর ভালো লাগে না। আসলে অমরেশের সঙ্গে যেতে ওর ক্ষীণ আপত্তিও ছিল। আপত্তির চেহারাটা ওর নিজের কাছেও তেমন স্পষ্ট ছিল না। অমরেশের অনুরোধ বার বার এড়াতে এড়াতে নিজের আপত্তির কারণটা বুঝতে পেরে শম্পা লজ্জিত হয়েছিল। বিয়েটা ওদের, শম্পার বি. এস্‌সি. পরীক্ষার পর হবে মোটামুটি ঠিক ছিল। তা বলে বিয়ের আগে অমরেশের ছোটখাটো দাবি যে ও মেটাতো না, তা নয়। বরং সেটা রঙীন খুশিতে হালকা নেশার আমেজ এনে দিত। কিন্তু বিয়ের আগেই অমরেশের সঙ্গে বেড়াতে গেলে, অমরেশের যে

দাবি মেটাতে হ'ত বলে শম্পা মনে করেছিল, তা ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কেমন যেন অশুচি মনে হ'ত নিজেকে।

ট্যাক্সিতে বসে অমরেশ বলছিল। "জানো, ব্যারিস্টার সত্যেন চ্যাটার্জী ওঁর ফ্যামিলি নিয়ে এবার কার্সিয়াং গিয়েছিলেন।"

"তাই নাকি। তাহলে তোমার ছাত্রী বীথিও গিয়েছিল বল।" মুচকি হেসে বলল শম্পা।

"হ্যাঁ, তা তো গিয়েছিল।"

"তাহলে তো তোমার সঙ্গীর অভাব হয়নি। দিব্যি সঙ্গীত-চর্চায় দিনগুলো কাটিয়ে দিয়েছ।"

"সঙ্গীর অভাব তো আমার কোনদিনই নেই।"

"বটে!"

"হ্যাঁ। অভাব আমার একটি জীবন-সঙ্গিনীর।"

"রক্ষে করো। এখন থেকেই তোমার এইসব ভাষা বেরোচ্ছে!" শম্পা হেসে উঠলো। অমরেশও হেসে ওর হাতে একটা মৃদু চাপ দিল।

সাধনা চা-এর যোগাড করছিলেন। হাবলু-কাবলু পড়তে বসেছে। ছোট মেয়ে মিন্টিটা মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। কাবলুটাই চেঁচিয়ে উঠল, "ওমা দিদি এসেছে।" সাধনা চিনির শিশিটা হাতে নিয়েই বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। শম্পা প্রণাম করতেই বললেন, "এলি কার সঙ্গে?"

"একলাই এলাম।"

"ওমা, তা লিখলেই তো পারতিস। তোর কাকা না হয় স্টেশানে যেত।"

"ও, না, স্টেশানে অমরেশবাবু গিয়েছিল।" শম্পা একটু ইতস্ততঃ করে বলল, "মেজকাকাকে আবার ছুটোছুটি করানো কেন? হয়তো টিউশানি কামাই হ'ত।"

"কোথায় টিউশানি!"

"মেজকাকার বুঝি এখন টিউশানি নেই?"

"না রে।"

শম্পা চিন্তিত হল।

"কাকীমা, বাদল আসেনি?"

"না তো। বোধহয় দু'একদিনের মধ্যে এসে পড়বে।"

বাদল শম্পার ছোটকাকার ছেলে। মেজকাকার কাছ থেকেই পড়াশোনা করে। গরমের ছুটিতে বাবার কাছে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে হাবলু-কাবলু দিদির দেখাদেখি গুটি-গুটি এগিয়ে এসে শম্পাকে একটা করে প্রণাম করে ফেলেছে। শম্পা বসে পড়ে চট্ করে দু'হাত দিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরে।

"হ্যাঁরে, গরমের ছুটিতে বুঝি খুব দুষ্টুমি করেছিস—কাকীমাকে বোধহয় সারা দুপুর ঘুমুতে দিতিস না।"

ওরা ঘাড় নাড়ে।

"দিদির কাছে মিথ্যেকথা বলা হচ্ছে। ছুটিটায় আমার হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে।" সাধনা বললেন।

"সত্যি কাকীমা, তোমার চেহারাটা ভারী খারাপ হয়ে গেছে। আর হাবলু-কাবলুকেও তো খুব একটা ভালো দেখছি না।"

সাধনা উত্তর না দিয়ে ম্লান হাসলেন। মিন্টি এতক্ষণ দিদির গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করছিল। এবার দাদাদের মাঝখান দিয়ে শম্পার বুকের কাছটিতে সরে এসে বলল, "দিদি, আমি।"

"ওমা, তাইতো. মিন্টিরাণীকে তো এতক্ষণ আদর করাই হয়নি।" বলতে বলতে শম্পা তিনজনকে হাতের বৃত্তের মধ্যে ঘিরে ফেলে।

"বাস্, দিদির আর হাত-মুখ ধুয়ে কাজ নেই, কাপড়-জামা ছেড়ে কাজ নেই, তোমাদের নিয়ে এইভাবে বসে থাকুক।" সাধনা বললেন।

হাবলু বড়। সুতরাং সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে সম্পার হাতটা ছাড়িয়ে নিতে চাইল। শম্পা হাসতে হাসতে ওদের আরও জোরে চেপে ধরল।

২

"অগ্নি-আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম"

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সাধনা একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলেন। শম্পা পাশে বসে খবরের কাগজটায় চোখ বোলাচ্ছিল।

"হ্যাঁরে, তুই বাড়ীতে কিছু বলেছিস?"

"কী কথা কাকীমা?"

"এই—অমরেশের কথা আর কি।"

শম্পা একটু লজ্জিত হল।

"না কাকীমা, বাড়ীতে আর কি বলব।"

"তাহলে আমি একটা দিদিমণিকে চিঠি লিখি, কি বলিস ?"

শম্পা মনে মনে হাসল। কাকীমা হাজার হোক, কলকাতার মেয়ে তো। মায়ের থেকে বেশ একটু আধুনিক-ই। সুতরাং অমরেশের ব্যাপারটা অনেকটা সহজ ভাবেই নিয়েছেন।

"না কাকীমা, এখন চিঠি লেখবার দরকার নেই। পরীক্ষার পর যা হয় করা যাবে।"

সাধনা মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা।"

শম্পার সঙ্গে অমরেশের ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারে সাধনা নিজেই কিছুটা দায়িত্ব বোধহয় স্বীকার করতেন। হাজার হোক, বড়-জা তাঁদের তত্ত্বাবধানেই তো মেয়েকে কলকাতায় পড়তে পাঠিয়েছেন। আর অমরেশ শম্পার মেজকাকা জীবতোষের পুরোনো ছাত্র। সুতরাং দায়িত্ব একটু আছে বৈকি। তবে অমরেশদের স্কুল বই-এর বিরাট ব্যবসা। সাধনার এই ভারী চমৎকার ভাসুর-ঝিটিকে যদি অমরেশের পছন্দ হয়ে যায়, তবে বট্-ঠাকুর আর দিদিমণির মত করাতে খুব বেশী দেরী হবে বলে সাধনা মনে করেন না। তাই এটুকু দায়িত্ব নিতে তিনি কার্পণ্য করেননি।

অমরেশ আসতো স্কুলে বই ধরানোর ব্যাপারে জীবতোষের সঙ্গে পরামর্শ করতে। শম্পার সঙ্গে পরিচয় ওর একেবারে প্রথম থেকেই। অর্থাৎ শম্পা যখন স্কুল-ফাইনাল পাশ করে প্রথম কলকাতায় পড়তে এল।

দেশে অবশ্য একটা কলেজ হয়েছিল। কিন্তু সেখানে সায়েন্স্ ছিল না। শিবতোষের ইচ্ছে মেয়েকে সায়েন্স পড়ানো। কলকাতায় ভাই-এর কাছে রেখে পড়াবেন কিনা এই নিয়ে অনেক ইতস্ততঃ করেছেন। এই বাজারে কলকাতায় একটি লোকের থাকা-খাওয়ার খরচ তো কম নয়। সে খরচ দেবার সামর্থ্যও তাঁর নেই। বড়জোর কলেজের মাইনেটাই না হয় দেবেন। সুতরাং স্কুল-মাস্টার ভাই-এর ঘাড়ে এ দায়িত্ব চাপানো কি ঠিক হবে? শম্পার মা বলে-ছিলেন, কী দরকার কলকাতায় পাঠাবার। এখানেই পড়ুক না।

মায়ের কথাটা শম্পার মোটেই ভালো লাগেনি। অবশ্য সায়েন্স্-আর্ট্স নিয়ে ওর তখন বিশেষ চিন্তা ছিল না। কলকাতার কলেজে পড়তে আসবে,

এটাই ওর কাছে আসল কথা। এরই মধ্যে এখানকার কলেজে যারা ভর্তি হবে সেইসব বন্ধুদের কাছে খবরটা দিয়ে তাদের ঈর্ষিত দৃষ্টির সামনে নিজেকে যথেষ্ট বিশিষ্ট করে নিয়েছিল। সুতরাং মা-বাবার দ্বিধাটা তার একদম ভালো লাগছিল না। মেজকাকা কাকীমা তো এখানে কয়েকবার এসেছেন। কাকীমাকে শম্পার খুব ভালো লাগে। শম্পা শুনেছে, কলকাতায় স্কুল-মাস্টারদের প্রাইভেট-টিউশানি, আর কোচিং-ক্লাসে নাকি অনেক আয় হয়। তবে আর অসুবিধে কিসের? তা ছাড়া মেজকাকা কি বাবার কথাটা একবার ভেবে দেখবেন না! ষোলোবছর বয়স থেকে বাবা মেজকাকা আর ছোটকাকাকে মানুষ করেছেন। নিজের লেখাপড়া ভবিষ্যৎ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে। সে খবর ওখানকার কে না জানে?

দশম শ্রেণীর ছাত্র শিবতোষ গাঙ্গুলী, স্কুলের সেরা ছেলে। প্রথম পুরস্কার, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি ইত্যাদি সব-কিছু পুরস্কারই তার। পুরস্কার-বিতরণীতে এসে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ওর সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলেছেন, এই নিয়ে পাড়ায় কী উত্তেজনা সে সব দিনে! শিবুদার ব্যায়ামের আখড়া আর লাইব্রেরীতে কে না আসতো!

শিবতোষের বাবা ছিলেন স্থানীয় স্কুলের হেড-পণ্ডিত। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে কী সূত্রে যেন আলাপ ছিল। 'সন্ধ্যা' কাগজ আসত তাঁর বাড়ীতে। ছোটবেলার একটা কথা শিবতোষের খুব মনে আছে। একদিন সন্ধ্যেবেলায় খেলাধূলো সেরে বাড়ী ফিরেই মায়ের কাছে গিয়ে চীৎকার জুড়ে দিলেন, মা, খিদে পেয়েছে। মা কিরকম যেন গম্ভীর ভাবে বললেন, শিবু, চুপ করো। মায়ের এরকম মুখের ভাব শিবতোষের অভিজ্ঞতায় ছিল না। উনি ভয় পেয়ে চুপ করে গেলেন। তারপর টুক্ করে বেরিয়ে এলেন। দেখলেন, উঠোনে, পেয়ারাগাছ-তলায় বাবা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে চুপ করে বসে আছেন। সন্ধ্যে হয়ে গেছে দেখেও ছেলেকে পড়তে বসতে বললেন না। হঠাৎ শিবতোষ দেখলেন, খিড়কির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ীর নতুন কাকীমা ওকে ইশারা করে ডাকছেন। এক ছুটে পালিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। নতুন কাকীমা ওকে ওদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে খেতে দিলেন। খেতে খেতে উনি কাকীমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে কাকীমা?"

"তোমার বাবার বন্ধু—সেই উপাধ্যায় মশাই ছিলেন না—তিনি জেলে মারা গেছেন।"

সেদিন ওঁদের বাড়ীতে রান্না হয়নি। তখন শিবতোষের বয়স আট-ন' বছর।

কিশোর শিবতোষের মনোজগতে উষার আলোর প্রথম স্পর্শ এনেছিল ঘরের কোণে বাণ্ডিল-ক'রে-রাখা ধূলি-ধূসর 'সন্ধ্যা'।

শিবতোষ তখন ক্লাস টেন এ পড়েন। একদিন পণ্ডিত-মশাই অনেক রাতে বাড়ী ফিরে দেখেন, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চারটি ছেলে নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছে। শিবতোষ পাশে দাঁড়িয়ে। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় পণ্ডিত-মশাই এর যেন মনে হলো, তিনজন হয়তো শিবতোষের সমবয়সী কিংবা কিছু বড়। আর একটি ওদের থেকে অনেক বড়। শিবতোষ এগিয়ে এসে বলল, "কলকাতা থেকে ওরা এসেছে। আমার বন্ধু।"

পণ্ডিতমশাই বললেন, "বেশ, বেশ। তা ওরা এখন দিনকয়েক থাকবে তো? কাল তাহলে—"

বাধা দিয়ে শিবতোষ বলল, "না বাবা, ওরা কালই চলে যাবে।"

"কালই চলে যাবে! ও, তা বেশ, তা বেশ।"

কেমন যেন একটু চিন্তিতভাবে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালেন পণ্ডিতমশাই।

"বাবা!"

শিবতোষের ডাকে ফিরে তাকালেন পণ্ডিতমশাই। কিরকম যেন কুণ্ঠিত স্বর শিবতোষের।

"ওরা যে এখানে এসেছে, আপনি বাইরে কোথাও বলবেন না।"

চমকে উঠলেন পণ্ডিতমশাই। যা সন্দেহ করেছিলেন, তাই! ও আগুনের আঁচ কেমন যেন তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু শিবু! শিবু যে তাঁর বড় ছেলে। অনেক যত্নে ওকে মানুষ করে তুলছেন। বড় হয়ে ও অধ্যাপক হবে। তাঁদের বংশের অধ্যাপনার ধারাকে ও নতুন যুগের আলোয় আলোকিত করবে। টুলো-পণ্ডিত না হয়ে, হবে কলেজের অধ্যাপক। এ আঁচে ও যদি ঝলসে যায়! না, না, ওকে সরিয়ে আনতে হবে। ছেলেগুলি চলে গেলে কালই বোঝাতে হবে। উপাধ্যায় মশাইকে একদিন জোর গলায় বলেছিলেন, কিছু পেতে হলে, কিছু দিতেই হয়। নিজের অনেক কিছু দিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু ছেলে!

দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুম হলো না তাঁর। শিবতোষের মা সারাদিন পরিশ্রমের পর কেমন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন। শিবতোষের ঘরে ছেলেগুলি জিনিসপত্র বাঁধা-ছাদা করছে। গভীর রাতে সমস্ত পাড়া যখন নিস্তব্ধ, ছেলে-

গুলি অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই জানেন, ছেলেগুলিকে হয়তো আর কোনদিনই তিনি দেখতে পাবেন না।

শিবতোষ গেল ওদের এগিয়ে দিতে।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেলে। দিন্দাদের বাড়ী থেকে লোক এসেছে। নরেন দিন্দার ছেলের খুব অসুখ। যেতে হবে। পণ্ডিতমশাই কবিরাজিও করতেন।

ছেলেটির খুব বাড়াবাড়ি চলছিল। দুপুরে একবার এসে স্নানাহার করে যাবার সময় পেয়েছিলেন মাত্র। অনেক রাত্রে যখন বাড়ী ফিরছিলেন, তখন ছেলেটি ভালোর দিকে মোড় নিয়েছে। নরেন হাত দুটো জড়িয়ে ধরে কী যেন বলতে চাইছিল। কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল এসেছিল। ক্লান্ত পণ্ডিত-মশাই-এর তখন আর কিছু ভালো লাগছিল না। নির্জন পথ দিয়ে বাড়ী চলেছেন। আবছা আলোয় পথের বালিগুলো চিক্‌চিক্ করছে। দু'ধারে কাজুবাদামের গাছগুলোয় পুঞ্জীভূত অন্ধকার। ফাঁকা মাঠের মাঝে মাঝে বালিয়াড়িগুলো যেন এই মফঃস্বল শহরের অতন্দ্র প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ কেমন যেন একটা অস্বস্তিতে তাঁর সমস্ত মনটা ভরে গেল। মনে হল, এই নির্জন পথে আকাশ, মাটি, গাছপালা, বালিয়াড়ি সবাই যেন চেতনা পেয়ে তাঁকে দেখছে। এমনকি তাঁর মনটা যেন স্বচ্ছ হয়ে ভেতরকার সমস্ত ভাবনা চিন্তাগুলোকে তাদের অন্তর্দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছে। দ্রুত পা চালালেন তিনি। সাবধান করে দিতে হবে শিবতোষকে, বোঝাতে হবে; অনুরোধ করতে হবে। তা নইলে যে আগুন নিয়ে খেলতে নেমেছে শিবতোষ, তা একদিন তাঁর বাড়ীর চালে লেগে ভস্মীভূত হয়ে যাবে তাঁর সাজানো সংসার।

বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে জিগেস করলেন, শিবু কোথায়। তিনি বললেন, এইতো খেয়ে উঠে ওর ঘরে গেল। চলে এলেন ওর ঘরে। কিন্তু শিবতোষ ঘুমিয়ে পড়েছে। ওকে ডেকে তুলবেন? না, থাক্, খুব ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে শিবতোষ, ভারী ভারী নিশ্বাস পড়ছে, কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। উনি আস্তে আস্তে শিয়রের জানলাটা খুলে দিলেন। তির্‌তির্ করে মৃদু একটা হাওয়া এসে ওর চুলগুলো স্পর্শ করে গেল। নিষ্পাপ, সরল এক কিশোরের ঘুমন্ত মুখখানির দিকে চেয়ে পণ্ডিতমশাই-এর মনে হলো, ক্রূর সংসারের বিষবাষ্প থেকে ও অনেক দূরে। বিপ্লবের অগ্নিক্ষরা পথের আঁচ ও এখনও নিশ্চয় পায়নি। ওকে তিনি বুঝিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

পরের দিন ভোরে আবার ডাকাডাকি। কী হল, ছেলেটার আবার কিছু বাড়লো নাকি? বেরিয়ে এলেন পণ্ডিতমশাই। দরজার সামনে এখানকার থানার দারোগা—তাঁর ছাত্র শ্যামসুন্দর মাইতি; সঙ্গে আর একজন পুলিশ-অফিসার। সমস্ত বাড়ীটা পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। কয়েকটা দ্রুত চিন্তার মুহূর্ত! শিবতোষ বোধহয় এখনও ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বাড়ী তো পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। পাড়া প্রতিবেশী এসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

বাড়ী সার্চ্ করে কিছুই পাওয়া গেল না। শিবতোষের ঘর থেকে বেরোলো 'ফাঁসির সত্যেন', 'শহীদ ক্ষুদিরাম' এইরকম দু'একখানা বাজেয়াপ্ত বই। আর একখানা থলির মতো কাপড়, কিছু মোড়া ছিল। ওপরে একটা সাহেবী কোম্পানীর ছাপ মারা। পরে জেনেছিলেন, কোম্পানীটা একটা বন্দুকের দোকান। ওদের নাকি বহু টাকার গুলী বারুদ-বন্দুক দিনকয়েক আগে চুরি হয়ে গেছে।

শিবতোষকে ওরা ধরে নিয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই ওকে জাগিয়ে তোলবার সময় পেলেন না! অনেক আগেই ও জেগে উঠেছিল।

শ্যামসুন্দরের তদ্বিরে প্রথম দিকে তাঁর ওপর খুব বেশী ঝামেলা হয়নি। একটা সাধারণ বিবৃতি নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া সেই চারটি ছেলের খবর জিগেস করলে তিনি সত্যিই বিপদে পড়তেন। তাঁর জবানবন্দী ছেলের বিরুদ্ধে যেত। কিন্তু, কেন জানেন না, জেরাতে ঐ প্রশ্নটা করা হয়নি।

বিরাট ষড়যন্ত্রের মামলা। গুলী-বন্দুক ইত্যাদি লুট, মহামান্য সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, পুলিশের সঙ্গে উড়িষ্যার জঙ্গলে প্রকাশ্য সংগ্রাম। দৈনিক কাগজের শিরোনামা সংবাদ। একদিন আদালতের কাঠগড়ায় দুটি ছেলেকে দেখে চেনা চেনা মনে হয়েছিল পণ্ডিতমশাই-এর। কিন্তু ঠিক চিনতে পারেননি। জেলে থাকতে থাকতে ছেলে দুটির স্বাস্থ্য এত ভালো হয়ে গিয়েছিল যে, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দচারী, রুক্ষ চুল, অনাহারে অনিদ্রায় কোটর গত চক্ষু, সেই চারজনের মধ্যে এরা ছিল, বুঝতে পারেননি।

এত দুশ্চিন্তা পণ্ডিতমশাই সইতে পারলেন না। পাড়ায় কেমন যেন একঘরে। সবাই যেন সন্ত্রস্তভাবে এড়িয়ে চলে। স্কুল কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের জন্য ওঁকে ছুটি নিতে বলেছেন। সুতরাং স্কুল নেই। এইরকম ভাবে দিনকয়েক যাবার পর শরীর ভেঙে পড়ল পণ্ডিতমশাই এর। এর ওপর আবার কলকাতা যাতায়াত আছে। শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন পণ্ডিতমশাই।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসবে, এ কথা এক নিজে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারেনি। সংসার-পরিক্রমা অসমাপ্ত হয়ে পড়ে রইল। তিনি নিজের মনকে যতদূর সম্ভব গুছিয়ে নিলেন।

মৃত্যুকালে পাড়াপ্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসেছিল। আগে আসতে পারেনি বলে দুঃখ করেছিল। পণ্ডিতমশাই শিবতোষের মাকে বলেছিলেন, এটা ওদের মনের কথাই। ওরা সত্যিই আসতে চেয়েছিল, কিন্তু সাহস করে পেরে ওঠেনি। এ নিয়ে তুমি দুঃখ কোরোনা।

তারপর দীর্ঘকাল মামলা চলার পর খালাস পেয়ে শিবতোষ একদিন বাড়ী ফিরে এলেন। সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে জনকয়েকের দ্বীপান্তর হল। দুজনের ফাঁসি। মামাতো-পিসতুতো ভাই তারা। একজন বয়সে অল্প কিছু বড়। শিবতোষ এখনও জানেন না ওদের দুজনের মধ্যে কে আগে মৃত্যুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

ছাড়া পেয়ে অকূল পাথারে পড়লেন শিবতোষ। বাবা নেই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিত্যক্ত, এক বিপ্লবীর মা পুত্রের পথ চেয়ে বসে ছিলেন। ছোট ছোট ভাই-দুটির হাত ধরে দাওয়ায় বসে স্তব্ধভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন অশ্রুমুখী মা।

জনকয়েক বন্ধুবান্ধব খুব গোপনে অবশ্য সাহায্য করেছিল। সে যাই হোক। শিবতোষ এখন কি করবেন? আবার বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বেন? দলের নেতা মারা গেছেন। নেতৃস্থানীয়দের জনকয়েক চলে গেছেন ভারতবর্ষ ছেড়ে। অধিকাংশ ধরা পড়ে গেছে। দু'চারজন এদিক ওদিক ছিট্‌কে পড়েছে। জার্মান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা যে সাহায্য পাঠিয়েছিল, সে জাহাজ সুন্দরবন অতিক্রম করে এসে পৌঁছতে পারল না বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। তাদের সঙ্গে সব যোগসূত্র গেল নষ্ট হয়ে। সত্যি, কতবড় একটা সংগঠন, কত দীর্ঘ-দিনের তিল তিল গোপন প্রচেষ্টা, কত তাড়াতাড়ি তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল।

মানকচু-ভাতে, কলমী-শাক-ভাজা আর বড়ির ঝাল দিয়ে ভাত খেতে খেতে ভেবে চলেন শিবতোষ। তাঁদের অসমাপ্ত কাজ কি পরবর্তীরা এসে তুলে নেবে? তাঁরা অন্তত চেয়েছিলেন মরে মরে দেশটা থেকে মৃত্যুর ভয় দূর করে দেবেন। কিন্তু কোথায়? মৃত্যু ছেড়ে, মিশতেই তো ভয় পায়। সন্ত্রাসবাদী ওরা। দেশ জুড়ে ওদের নিয়ে সন্ত্রাস। স্কুলের কোন সহপাঠীর

সঙ্গে দেখা হলে, দাঁড়িয়ে দুটো কথা বললেই, বাড়ীতে তাদের সামাল সামাল রব। 'ভালো আছেন, যোগীন কাকা!' বলে কোন বর্ষীয়ানকে সম্ভাষণ করলে তিনি ব্যস্ত হয়ে বলবেন, হ্যাঁ বাবা, ভালো আছি। বাড়ীর সব খবর ভালো তো? আচ্ছা চলি, আমাকে একবার ইয়েতে যেতে হবে।' কোথায় যে যেতে হবে তাড়াতাড়িতে মনে পড়ে না।

পেয়ারাগাছ তলায় বসে ভাবেন শিবতোষ। স্কুলে ফিরে গিয়ে ফের পড়াশোনা শুরু করা চলে না। রোজগারের পথ দেখতে হবে। তা না হলে ছোট ছোট ভাই দুটোর পড়াশোনা শেষ।

বাজারের পাশ দিয়ে আসছিলেন সেদিন। "শিবু শোন।" নরেন দিদ্দা ডাকল।

শিবতোষ এগিয়ে গেলেন। ডেকে কথা বলা তাঁর জীবনের এ অধ্যায়ে নতুন।

"তুমি নাকি চাকরি খুঁজছো?"

"হ্যাঁ। কেন? সন্ধানে আছে নাকি কোন?"

"না, ঠিক তেমন কিছু নেই; আমি একটা প্রেস খুলেছি। তার দেখাশোনা করার জন্য একজন লোক দরকার। তবে মাইনে বেশী দিতে পারব না। যদি তুমি উপস্থিত নাও তো দেখ।"

"আমি নিশ্চয়ই নেব, নরেনদা।"

হঠাৎ যেন একটা অকূলে কূল পেলেন শিবতোষ।

জীবতোষ, অনুতোষকে যত্ন করে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

জীবতোষ ম্যাট্রিক পাস করল। ওখানে তখন কলেজ হয়নি। ধারধোর করে পাঠালেন ওকে কলকাতায়। উনি কিছু দিতেন। জীবতোষও টিউশানি করত। বি. এ. পাস করে জীবতোষ কলকাতায় স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করল।

অনুতোষ কিন্তু ব্রিলিয়ান্ট্ ছেলে। ম্যাট্রিকে কম্পীট্ করল। কলকাতায় জীবতোষের বাসায় রেখে শিবতোষ ওকে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করে দিলেন। অনুতোষও টিউশানি করতে চেয়েছিল। শিবতোষ রেগে গিয়ে ভীষণ ধমক দিয়েছিলেন ছোটভাইকে। জীবতোষকে কড়া হুকুম দিয়েছিলেন, ওর দিকে নজর রাখতে, যেন পড়াশোনা ছাড়া আর কোনদিকে মন না দেয়। দরকার হয় তো, জীবতোষ যেন আর একটা টিউশানি নেয়।

এই সময়টা খুব অসুবিধে হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ানোর খরচ,

তার ওপর কলকাতার বাসা-খরচ। বেশ কিছু ধার-দেনা হয়ে গিয়েছিল শিবতোষের। কিন্তু তা হোক। আই. এ.-তেও অনুতোষ কম্‌প্লীট্‌ করে। বি. এ.-তে ফার্স্ট। এম. এ.-তেও। এর পর অনুতোষ ওঁদের নাগালের বাইরে চলে গেল। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ীর সাহায্যে বিলেতে চলে গেল। অবশ্য শিবতোষের সানন্দ সম্মতিতেই। বিলেত থেকে ফিরে সরকারী চাকরীর উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত হল অনুতোষ। অবশ্য সেই সময় একদা বিপ্লবী দাদার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অনুতোষের মতো রাজ কর্মচারীর পক্ষে কিছুটা অসুবিধের ছিল। তবে মা যতদিন বেঁচে ছিলেন, অনুতোষ মায়ের নামে টাকা পাঠিয়েছেন; কলকাতায় এলে দেখা করে এসেছেন মায়ের সঙ্গে। দু'চারদিন কাটিয়ে এসেছেন দাদার সংসারে। অবশ্য তাঁর স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা সেখানে কোনদিন আসেনি। কলকাতায় এলে তাঁরা অনুতোষের শ্বশুরবাড়ীতে উঠতেন।

শিবতোষ বিয়ে করেছিলেন, মায়ের অনুরোধে। বাবা মারা যাবার পর মা তাঁকে কোনদিন কোন অনুরোধ করেননি। মা ও ছেলের মধ্যে কেমন যেন একটা অভিমানের সম্পর্ক ছিল। অনুতোষ এম এ. পাস করবার পর তিনি অনুরোধ করেছিলেন শিবতোষকে। বলেছিলেন এই ই তাঁর প্রথম এবং শেষ অনুরোধ শিবতোষের কাছে। শিবতোষ কোন আপত্তি করেননি। নিজেও যথাসময়ে দাঁড়িয়ে থেকে জীবতোষের বিয়ে দিয়েছেন। সে কলকাতায় সংসার পেতেছে। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে জীবতোষ মাঝে মাঝে বেড়িয়ে যান শিবতোষের কাছে।

শিবতোষের বড় ছেলে ক্লাস টেন্‌-এ উঠে টাইফয়েড্‌ জ্বরে মারা যায়। 'সেইদিন প্রথম শিবতোষ পেয়ারাগাছতলায় বসে নিঃশব্দে কেঁদেছিলেন। পুত্রের বিয়োগব্যথা ছাপিয়ে বার বার তাঁর হৃদয়ে ভেসে এসেছিল, বহুবর্ষ আগেকার এক প্রান্তজীবন বৃদ্ধ পণ্ডিতমশাই-এর মর্ম বেদনা। যিনি ঠিক এই পেয়ারাগাছ-তলাটিতে বসেই বিধ্বত পুত্রের ধূলি-ধূসর গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। যে ছেলের সঙ্গে তাঁর আর জীবনে দেখা হয়নি।

শম্পাই এখন তাঁর জ্যেষ্ঠ সন্তান। ওর পরে আর একটি ছেলে এবং দুটি মেয়ে। শিবতোষ জানতেন, বাবা তাঁকে বিজ্ঞান পড়াতে চেয়েছিলেন। প্রান্ত-কৈশোরে নাইট্রিক অ্যাসিড কিংবা পটাসিয়াম ক্লোরেটের নাম শুনলে শিহরিত হয়ে উঠতেন। 'ভাবতেন, বিজ্ঞানের মায়ারাজ্যেই বুঝি-বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা

লুকিয়ে আছে। কিন্তু দুই ভাই-এর কেউই বিজ্ঞান পড়েনি। শম্পা বড় ছেলের মতো অতটা তীক্ষ্ণধী নয়। তবু তিনি ওকে আই. এস্‌সি. পড়তে পাঠিয়েছিলেন কলকাতায়। অবশ্য তার আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ হয়ে গেছে। বিজ্ঞানের মায়ারাজ্য থেকে শম্পা ভারতবর্ষকে কী দেবে, শিবতোষ তা জানতেন না।

৩

"এ এক জোনাকী মন জ্বলে আর নেভে
অন্ধকার পার হবে ভেবে
ইতি-উতি ধায়"
—প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিকেলের দিকে শম্পা গেল অরূপদের বাড়ী। হাতব্যাগে সন্দেশ আর কাজুবাদাম নিয়ে। প্রমীলা মেঝেতে শুয়ে শুয়ে একখানা মাসিকপত্রিকা ওল্টাচ্ছিলেন। পাশে পানের ডিবে আর জর্দার কৌটো। ওপাশে রান্নাঘরে ঠাকুর রান্না করছে। উনি এখান থেকে মাঝে মাঝে নির্দেশ দিচ্ছেন, "ও ঠাকুর, পটোল-ভাজাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাজো, কাঁচা থাকেনা যেন। আলুর-দমে বেশী ঝাল দিও না, বাবু খেতে পারেন না।" শম্পা ঘরে ঢুকতেই, "ওমা, শম্পা কখন এলি?" বলতে বলতে উঠে বসলেন।

"আজ সকালে, কাকীমা।" শম্পা প্রমীলাকে প্রণাম করল।

"তা বাপু, তোদের দেশের জল-হাওয়ার গুণ আছে। বলতে নেই, তোর চেহারাটি বেশ ফিরেছে। তবে রঙটা একটু ময়লা হয়ে গেছে।"

"ওমা, কাকীমা কি বলছেন! আমার রঙটাই তো ময়লা।" শম্পা হেসে বলে।

"ইস! কে বলে তোর রঙ ময়লা? আহা, এমন মুখশ্রী—এমন রঙ!" বলতে বলতে প্রমীলা শম্পার চিবুক ছুঁয়ে চুম্বন করেন। শম্পা একটু লজ্জিত হয়।

"কাকীমা এগুলো কোথায় রাখব?"

"কী রে ওতে?"

"ওই সন্দেশ আর কাজুবাদাম আছে।"

"ওমা, কী মেয়ে রে! অতদূর থেকে বয়ে বয়ে কাকীমার জন্যে এনেছিস?"

"বা রে, আপনি তো বলে দিয়েছিলেন।"

"ওমা, শোন কথা! খোকা তো দিনে-রাতে একটা কাজও করে না, বলে দিলেও না। জিগেস করলেই এক উত্তর, স্যরি, ভুলে গেছি।"

"খোকা আপনার আদরের ছেলে। ওর কথা বাদ দিন।"

"ওমা, তুইও শেষে এ-কথা বললি! ওর বাবাকে আমি কতবার বলেছি, ছেলেকে অত আদর দিওনা। লোকে আমাকেই দুষবে। এখন হল তো!"

এমন সময় ঘরে প্রবেশ করল অরূপ; হাতে স্টেথিস্কোপ। প্রমীলা দরজার দিকে পেছন ফিরে বসেছিলেন বলে ওকে দেখতে পেলেন না। শম্পা দেখতে পেয়ে মুচকি হাসল। তারপর প্রমীলাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "না কাকীমা, অরূপ আপনার ভারী ভালো ছেলে। নিন্, এখন উঠে এগুলো তুলে রাখুন তো? আচ্ছা দাঁড়ান, আগে একটা খেয়ে দেখুন।" শম্পা বাক্সটা খুলতে লাগল।

"ওমা, দেখ দেখ, মেয়ের কাণ্ড দেখ! এখন খাব কি রে? রেখে দে, বরং—"

"না কাকীমা, আমি কোনও কথা শুনব না। আমি বলে কত কষ্ট করে অতদূর থেকে নিয়ে এলাম। আপনাকে এখনই খেতে হবে। নিন, ধরুন -"

এমন সময়ে অরূপ চুপি চুপি এসে পেছন থেকে মায়ের সামনে হাতটা বাড়িয়ে ধরল। প্রমীলা চমকে ফিরে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চোখে পড়ল, অরূপের পায়ে জুতো।

"ফের হতভাগা, তুই জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকেছিস! বেরো বলছি, দূর হ এখনই, দূর হ মুখপোড়া! এই-এই,—ওতে হাত দিবিনা বলছি—নোংরা হাত—"

শম্পা অরূপের হাতে একটা সন্দেশ দিল। অরূপ সন্দেশ চিবোতে চিবোতে দরজার কাছে সরে এলো।

"দেখলি তো, দিনরাত আমাকে কিরকম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে। আর তুই বললি, আমি আদর দিই।"

শম্পা হাসতে লাগল। অরূপ সন্দেশটা গিলে বলল, "দেখলে তো, একমাত্র ছেলে,—সারাদিন খেটে-খুটে ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ী ফিরল। তাকে দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিয়ে মা-জননী নিজে সন্দেশ টেস্ট করছেন।"

"ক্ষিধে না পেলে কবে বাড়ী ফিরিস রে মুখপোড়া? যা রান্নাঘরে, খাবার ঢাকা দেওয়া আছে। ঠাকুরকে বললেই দেবে।"

অরূপ চলে যাচ্ছিল। প্রমীলা আবার তাকে ডেকে বললেন, "আর—এই শোন্, হাত-মুখটা ধো আগে।"

অরূপ যাবার সময়ে শম্পাকে ইঙ্গিতে পাশের ঘরে আসতে বলল। শম্পা হেসে ঘাড় নাড়ল।

"কাকীমা, কাকাবাবু কখন বাড়ী ফিরবেন?"

"সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবে। কেন রে?"

"আমার ভীষণ দরকার, কাকীমা। এলেই কিন্তু আমায় বলবেন। আমি অরূপের ঘরে আছি।"

অরূপ সিগারেট ধরাচ্ছিল। শম্পা বিরক্ত ভঙ্গীতে বলে উঠল, "কি অনবরত সিগারেট খাওয়া! ঘরে কি বসতে দেবেনা ঠিক করেছ?"

"তাহলে তো অমরেশবাবুর ঘরে তোমার জায়গাই হবে না।" পরম ঔদাসীন্যে জবাব দিল অরূপ।

"সে-সমস্যার কথা তোমার না ভাবলেও চলবে।"

শম্পা উঠে গিয়ে পাখার স্পীড্‌টা বাড়িয়ে দিল। হাল্‌কা-হাল্‌কা নীলচে ধোঁয়াগুলোর বিলম্বিত লয়টা দ্রুততালে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল।

শম্পা এসে বসতেই অরূপ বলল, "আগস্ট মাসে আমাদের 'বর্ষামঙ্গল' কিংবা 'শেষ-বর্ষণ', যেটা হোক একটা নাবছে। কিন্তু অসুবিধে হয়েছে, দেবুকে পাচ্ছিনা।"

"কেন, দেবেশ কি ক্লাব ছেড়ে দিয়েছে নাকি?"

"আরে, না না। তা নয়। ওদের অফিসে নানারকম গণ্ডগোল চলছে; ছাঁটাই-নোটিশ আর কী কী যেন সব দিয়েছে। ও তো গত পঁচিশে-বৈশাখের অনুষ্ঠানেও ছিলনা। ও, কী খাটুনী যে হয়েছে আমার!"

"তাহলে তো, এবারেও তোমাকে একলাই সামলাতে হবে।"

"পাগল নাকি! তুমি না থাকলে, ওসব আমি পারব না। আর তা ছাড়া এবারে ইমারজেন্সী অফিসার হয়েছি। অত সময় আমার নেই।

শম্পা মৃদু হাসল।

"হাসলে যে! তুমি থাকবেনা নাকি?"

শম্পা হেসে ঘাড় নাড়ল।

অরূপ রাগ করে বলল, "তাহলে ক্লাবটা তুলে দাও।"

"একটা মেয়ের অভাবে সত্যিই যদি ক্লাবটা উঠে যায়, তাহলে আর সে-ক্লাব রেখে লাভ কি ?"

"বেশ!"

গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিল অরূপ। শম্পা মনে মনে হেসে বলল, "বাবুর অমনি রাগ হয়ে গেল। আমার অবস্থাটা একটু ভেবে দেখ ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, জানি,—ফোর্থ-ইয়ার হল, পড়াশোনার চাপ, হাবলু-কাবলুকে পড়ানো, কাকীমার শরীর খারাপ—হেন-তেন,—তোমার আর সময় কোথায়!"

শম্পা হেসে ফেলে বলল, "আচ্ছা বাবা হয়েছে! কী কী গান সিলেক্ট্ করেছ দেখি।"

অরূপ কোন কথা না বলে একখানা কাগজ বাড়িয়ে দিল। শম্পা পড়তে পড়তে বললে, "মন মোর মেঘের সঙ্গী—গাইবে কে ? তুমি নাকি ? দেখ, আর যাই করো, এই গানটার ওপর দিয়ে স্টীম-রোলার চালিও না।"

অরূপ চটতে গিয়ে হেসে ফেলল।

'মন মোর মেঘের সঙ্গী'—শুরু করার মতো সময়ই বটে! শম্পা ভাবল। নরেন দিন্দা বলেছে, প্রেস বিক্রি করে দেবে। মোটেই নাকি চলছে না। ঐটুকু মফস্বল শহরে কতগুলো প্রেস হয়ে গেল দেখতে দেখতে। আর সবচেয়ে ক্ষতি হয়ে গেল, ওখানকার কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজের ছেলেকে দিয়ে একটা প্রেস খোলানোয়। শিবতোষের প্রভাব-প্রতিপত্তিতে যা-ও বা অর্ডার পাওয়া যেত, তার বেশীর ভাগই উনি টেনে নিয়েছেন। এখন প্রেসের যা অবস্থা, তাতে মাইনেটাও একসঙ্গে পাওয়া যায় না। দু'তিন কিস্তিতে নিতে হয়। ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর ছোটকাকা আর টাকা পাঠাতেন না। মেজকাকা আগে কিছু কিছু সাহায্য করতেন। ইদানীং নিজের সংসার নিয়ে বড্ড জড়িয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া শম্পা তো একরকম তাঁদের কাছেই রয়েছে। শম্পার পরের ভাইবোন তিনটি বড় হয়েছে। সংসার-খরচও বেড়েছে অনেক।

"তুমি এত সীরিয়াস্ হয়ে পড়েছ কেন ?" অরূপ জিগেস করল।

অবাক হয়ে শম্পা বলল, "তার মানে ?"

"তার মানে, ঘর-গোছানোর তো এখনও দেরি আছে। এখন থেকেই সব-কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিতে হবে নাকি ?"

না, অরূপটা নেহাতই ছেলেমানুষ!

"কী ছেড়ে-ছুড়ে দিতে দেখলে বল তো?"

"নিজেদের তৈরি-করা ক্লাবটা তো তুলে দিতে চাইছো।"

"তাহলে তো দেবেশকেও অপরাধী করতে হয়।"

"দেবেশের প্রয়োজনটা অন্যরকম।"

"আর আমার প্রয়োজনটা সম্পর্কে তুমি বুঝি খুব ওয়াকিবহাল?"

"তা বলতে পার। শুনছি তো, অমরেশবাবু আর নাকি অপেক্ষা করতে রাজী নন।"

অরূপ মৃদু হেসে কথাটা বলল। শম্পাও হাসল। শম্পা হাসল, তার কারণ, ঠিক এই মুহূর্তে একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। সাংসারিক অভাব-অভিযোগ নিয়ে শিবতোষের নিস্পৃহা লক্ষ্য করে আজকাল শম্পার মা দিনরাত গজগজ করেন। মাঝে মাঝে রাগ করে বলে ওঠেন, "এমন লোকের বিয়ে করা কেন।" এ প্রশ্নের উত্তর বাবা আর কাকে দেবেন। পঞ্চাশোত্তর শিবতোষকে শম্পা দেখেছে, পেয়ারাগাছটার তলায় চুপচাপ বসে থাকতে। বিকেলের এলোমেলো হাওয়ায় সাদা চুলগুলো উড়ছে। বাবা বসে বসে কী ভাবছেন, কে জানে!

ওখানকার কংগ্রেস-মহলের কেউ কেউ অবশ্য শিবতোষকে বলেছিলেন, নির্যাতিত দেশকর্মী হিসেবে সাহায্য নিতে। শিবতোষের দীক্ষাগুরুই তো এখন মন্ত্রী। মৃদু হেসে শিবতোষ এড়িয়ে গেছেন সে-সব প্রস্তাব। জীবনের আরব্ধ ব্রত তিনি অসমাপ্ত রেখে চলে এসেছিলেন। সঙ্গী-সাথীদের—যারা ফাঁসির মঞ্চ অবধি পৌঁছয়নি, তাদের অনেকেই আবার নতুন করে পথ-চলা শুরু করেছিল গান্ধিজীর প্রেরণায়। উনিশশো-বিশের উত্তেজনায় শিবতোষ যেন ভয়ে বাড়ী আর ছাপাখানার ভেতরে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারতেন না। দূর থেকে বিস্ময়ে আনন্দে লক্ষ্য করতেন আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি। একি কাণ্ড! হাজার হাজার লোক বেরিয়ে এসেছে—কিন্তু অন্ধকার পথে তাদের পদযাত্রা নয়। প্রশস্ত রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের যাত্রা। যারা যোগ দিতে পারেনি, তারাও এসেছে, তাদের অভিনন্দন জানাতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেছে যোগীন-কাকাকে, শিবতোষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা-বলা এড়াবার জন্য তাঁর সেই ব্যস্ত পলায়নপর মূর্তিখানি। নিঃশ্বাস ফেলে শিবতোষ ভেবেছেন, এদের মধ্যে যারা ফিরবে, তারা কি তাঁদের মতো সংস্কার-

জীবনে অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে থাকবে! অবশ্য আস্তে আস্তে মানুষের সে-মনোভাব যে বদলে গেছে, তা শিবতোষ নিজের জীবনেই বুঝতে পেরেছিলেন। সভা-সমিতি থেকে নিমন্ত্রণ আসত। কংগ্রেস থেকে তাঁকে সেবার স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শানে দাঁড়াবার জন্য অনেক ধরেছিল। অনুতোষের বিলেত যাবার আগে। শিবতোষ রাজী হননি।

বড়ছেলেকে কোলে করে শিবতোষ দেখেছিলেন ত্রিশ-সালের স্বেচ্ছাসেবকদের —মার্চ্‌ করে তারা চলেছে সমুদ্রের ডাকে। তারপর আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এসেছেন।

বিয়াল্লিশ-সালের কথা শম্পার আবছা মনে পড়ে। তাদের শহরে আর আশ-পাশের অঞ্চলে প্রচুর লোক এসেছিল কলকাতা থেকে পালিয়ে, জাপানী বোমার ভয়ে। জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। একদিন সকালে শম্পা দেখল তাদের পেয়ারাগাছ-তলায় একটা উত্তেজনা। কয়েকজন প্রতিবেশী ঘিরে ধরেছে শিবতোষকে। উনি খবরের কাগজখানা পড়ে শোনাচ্ছেন। বাবার শান্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর শম্পার ভারী ভালো লাগত। পায়ে পায়ে এসে ওদের কাছে দাঁড়াল। বাবার হাতে-ধরা কাগজখানায় গান্ধিজীর একটা মস্তবড় ছবি। হাত-দুটো জোড় করা, মুখে মৃদু হাসি।

"কি হয়েছে রে, দাদা?" পাশে দাঁড়িয়ে থাকা, উঁচু-ক্লাসে পড়া দাদাকে জিগেস করল শম্পা।

"চুপ কর্! গান্ধিজীকে ধরে নিয়ে গেছে। জহরলাল, আজাদ—এদেরও ধরেছে।"

শম্পা শুধু গান্ধিজীকে চিনত। উঁচু-ক্লাসে পড়া দাদার ওপর তার একটা শ্রদ্ধা হল।

সেদিন ওদের স্কুল হল না। দাদাদেরও। উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নাকি বেরিয়ে গেছে। ও দুপুর থেকেই পাশের বাড়ীর মিনুর সঙ্গে এক্কা-দোক্কা খেলছিল। হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল। লোকজন দৌড়চ্ছে। একজন তো আর একটু হলে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিচ্ছিল। ওরা সরে এলো। এমন সময় মা দরজার আড়াল থেকে চাপা স্বরে ডাকলেন, "শম্পা, বাড়ী চলে এসো।"

শম্পা বাড়ী এলে, মা ওকে জিগেস করলেন, দাদাকে দেখেছে কিনা। শম্পা দেখেনি। মা দরজা বন্ধ করে বসে রইলেন। একটু পরে দাদার হাত

ধরে বাবা বাড়ী ফিরলেন। বাড়ী ফিরে দাদাকে কী বকুনি বাবার! দাদা নাকি আর-কতকগুলো ছেলের সঙ্গে মিশে পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছিল। ওমা, কী সাহস দাদার! পুলিশ যদি ওকে ধরে নিয়ে যেত! ভাগ্যিস, বাবা শহরে হাঙ্গামার খবর পেয়ে প্রেস বন্ধ করে দিয়ে বাড়ী চলে আসছিলেন। তারপর দু'একদিন ধরে শহরে নাকি কী সব গোলমাল হল। দোকান-বাজার বন্ধ। বাবা কাজে বেরোলেন না।

এই সময়ে একদিন খবর এলো, শম্পাদের মামার বাড়ী খেজুরীগ্রাম নাকি থানা লুট করে নিয়ে স্বাধীন হয়ে গেছে। সেটা কি ব্যাপার শম্পা বোঝে নি, কিন্তু বাবাকে দেখেছিল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠতে। হয়তো তখনো ছাইয়ের তলায় একটু আঁচ ছিল।

তারপর থেকেই যেন সংসারটার চেহারা আস্তে আস্তে পাল্‌টে যেতে লাগল। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ—এক-একটি পদচিহ্ন রেখে রেখে চলে গেল। দাদা মারা যাবার পর থেকে বাবার শরীর ভেঙে পড়ল। ধার-দেনা এখন চারদিকে। এবারে বাড়ী গিয়ে শম্পা দেখে এসেছে, প্রায় রোজই শিবতোষের কাছে পাওনাদারেরা আসত। তাদের অসহিষ্ণু কথাবার্তা থেকে বোঝা যেত, নেহাত শিবতোষ বলেই তারা বিশেষ একটা কিছু করতে পারছে না। কিন্তু এইরকম ভাবে মান বাঁচিয়ে চলা শক্ত। এই-যে জীবনবাবু—পাড়াতে ওঁর একটা বড় গোলদারী দোকান আছে। শিবতোষকে উনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। ওঁর দোকানে শিবতোষের যে প্রচুর টাকা দেনা, কোনদিন উনি তা চান নি। কিন্তু ইদানীং দোকানের অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়াতে, ধার-টার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। অবশ্য শিবতোষকে তার মধ্যে ধরেন নি। কিন্তু শম্পা জানে, জীবনবাবুর দোকানে ধার না পাওয়া গেলে, যাও বা তাদের বাড়ীতে দু'বেলা হাঁড়ি চড়ছে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে। এমনি আরও অনেক। গোটা গরমের ছুটিটায় শম্পা ভেবেছে, কী করবে। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে একটা চাকরি-বাকরি নেয়। কিন্তু ওখানে চাকরি মানে মেয়েদের স্কুলে টীচার হওয়া। তার জন্য অন্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া দরকার। তাই শম্পা ঠিক করেছিল, কলকাতায় এসে যাহোক একটা কিছু ব্যবস্থা করবে।

একটা মাসিক পত্রিকা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে শম্পা তাই ভাবছিল অরূপের কথাগুলো। নাইট-ডিউটি থাকায় অরূপ চলে গিয়েছিল। মহেশবাবু এখনও ফেরেন নি।

অরূপ প্রায়ই অমরেশের প্রসঙ্গ তুলে খোঁচা দেয়। কেন ? যাবার আগে অরূপ বলে গেল, "বিয়ের পর নাকি জীবনের দৃষ্টিকোণগুলো বদলে যায়। তাই বলছিলাম, আর কিছুদিন এমনি করেই কাটাও না ? ক্লাবটাও তাহলে আর কিছুদিন চলে।"

এরকম ভাবে বলার মানে ! বিয়ের পর শম্পা কি তার কাজকর্ম, বন্ধু-বান্ধব এসব ছেড়ে দেবে নাকি ? সহজ বন্ধুত্বের দাবি তো জীবনে কম নয়।

মহেশবাবু ফিরতেই প্রমীলা বলে উঠলেন, "তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে ?"

"মিটিং শেষ হতে দেরি হল।—তারপর শম্পা—কেমন আছিস ?"

"ভালো আছি, কাকাবাবু!" শম্পা উঠে এসে মহেশকে প্রণাম করল।

"থাক্ রে, থাক্ ! হয়েছে, হয়েছে। তা এত রাত অবধি এখানে রয়েছিস, তোর কাকা আবার ভাববে না তো।"

"ওকি আর সাধ করে বসে রয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে সেই বিকেল থেকে এসে বসে আছে।" ঝংকার দিয়ে উঠলেন প্রমীলা।

"সেকি !" ব্যস্ত হয়ে উঠলেন মহেশ, "তুমি তো জানতে, আজ গার্ল্‌স্ স্কুলের মীটিং।"

"তোমার মীটিং যে এত রাত অবধি গড়াবে কি করে জানব বল। ও-বেচারাকে তাই বসিয়ে রেখেছি।"

"আচ্ছা, তা বেশ করেছ।" মহেশ আর প্রমীলাকে ঘাঁটালেন না।

"তা কী ব্যাপার রে শম্পা ?"

"কাকাবাবু, আপনাকে একটা কথা বলছিলাম কি—" কথাগুলো মনে মনে একটু গুছিয়ে নিল শম্পা, "আমার তো দুপুরে কলেজ। সকালে বা সন্ধ্যের দিকে একটা ছোটখাটো কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন না ?"

"সকালে বা সন্ধ্যের দিকে"—কথাগুলো একবার আবৃত্তি করলেন মহেশ, "তার মানে, তুই কি টিউশানি করতে চাস ?"

"টিউশানি না হলেই ভালো হয়। কিছু বেশী টাকার দরকার। মানে, বাবাকে পাঠাতে হবে।"

"ও ! তাহলে তো—" চিন্তা করতে লাগলেন মহেশ, "আর তাহলে কি করা যায়—"

"কেন, তুমি তো গার্ল্স্ স্কুলের সেক্রেটারি। দিন নেই রাত নেই, মীটিং-ই করছ, ওখানে একটু চেষ্টা করে দেখতে পার না?" প্রমীলা আবার ঝংকার দিয়ে উঠলেন।

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। ওদের সকালে যে সেক্শান্টা আছে ওখানে একজন টীচার নেবার কথা আজ মীটিং এ পাস হয়েছে। কিন্তু এটা "

"ওমা! কী আক্কেল গো! এই কথাটাই তুমি ভুলে বসে রাজ্যি শুদ্ধু হাতড়ে বেড়াচ্ছ ওর চাকরির জন্যে! অ্যাঁ, কী কাণ্ড!"

"না, না, মানে—"

"মানে আবার কি। ওখানেই ওকে বসিয়ে দাও।"

"দেখা যাক, কি করতে পারি।"

"দেখা যাক মানে—তুমি না ওদের কমিটিতে আছ! দিন নেই রাত নেই, মীটিং করছ। তা ছাড়া ওদের হেড-মিস্ট্রেস বকুল না মালতী, সে তো আবার তোমারই ছাত্রী।" প্রমীলার মুখের সামনে মহেশ বোধহয় দাঁড়াতেই পারবেন না!

"না, না, তা বলছি না। বলছি যে, স্কুলের চাকরিটা নিলে ওর কলেজে ফার্স্ট্ পিরিয়াড অ্যাটেণ্ড্ করা মুশকিল হবে। ছুটি যে সময় হয়—তাতে–" মহেশবাবু একটু ভাবতে লাগলেন।

শম্পা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "একটু দেরি হলেও আমি ম্যানেজ করে নিতে পারবো। স্কুলের ছুটি হয় কখন?"

মহেশবাবু কিছু বলার আগেই প্রমীলা বলে উঠলেন, "দেরি হবেই বা কেন? ওকে এক পিরিয়াড আগেই ছুটি দিয়ে দেবে।"

মহেশবাবু সরাসরি আপত্তি না করে বললেন, "দেখি, কি করতে পারি।"

"এও যদি না পারবে, তবে আর কমিটিতে আছ কি করতে? দিন নেই রাত নেই, খালি মীটিং গা!"—প্রমীলা বোধহয় আজ কোমর বেঁধে ঝগড়াই করবেন।

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে সব হবে খন। - তা হ্যাঁরে শম্পা, তুই যে এখন চাকরি নিতে চাইছিস, তোর তো এবার ফোর্থ্-ইয়ার হল। সামনে পরীক্ষা। অসুবিধে হবে যে।"

"না, কাকাবাবু। অনার্স ছেড়ে দিয়েছি, সুতরাং খুব একটা অসুবিধে

হবে না। তা ছাড়া"—শম্পা মুখটা নীচু করে বলল, "না নিলেও আর চলছে না।"

"হ্যাঁ, সে তো বুঝতেই পারছি। তোর কাকার আবার যা মতিগতি—"

"কেন, ওর কাকা আবার কি করলেন ?" প্রমীলা জিগেস করলেন।

"জীবতোষবাবু নিজের স্কুলের ছাত্রদের পড়ান না। অন্য স্কুলের ছাত্র, ওঁর কাছে কে আর পড়তে আসছে। তাই টিউশানি বিশেষ পান না বললেই হয়। জীবতোষবাবুর এখন টিউশানি আছে নাকি রে শম্পা ?"

শম্পা ঘাড় নাড়ল।

প্রমীলা একটু অবাক হয়ে বললেন, "উনি নিজের স্কুলের ছাত্র পড়ান না কেন ?"

মহেশ প্রশ্নটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে বললেন, "না মানে, ওনার হয়তো, নীতির দিক থেকে আপত্তি। যাক সে-কথা। শম্পা, তুই মা আর দেরি করিস নি। রাত অনেক হল।"

"হ্যাঁ, যাই কাকাবাবু। কাকীমা, আজ তাহলে চলি।"

হ্যাঁ, আয় !"

শম্পা চলে যেতে প্রমীলা বললেন, "ওমা, অতটুকু মেয়ে চাকরি করতে বেরোবো আর কাকা নীতি আঁকড়ে বাড়ীতে বসে থাকবেন !"

"ওসব কথাগুলো ওর সামনে তোলা কি ঠিক হ'ত ?" মৃদুভাবে অনুযোগ করলেন মহেশবাবু।

"তা হয়তো হ'ত না, কিন্তু উনি এরকম করবেনই বা কেন ? তুমি তো নিজের স্কুলের ছাত্র পড়াচ্ছ।"

মহেশবাবু ফাঁপরে পড়ে গেলেন। বাইরের কর্মজীবনের বহু ঘটনাই আছে যা সহধর্মিণীকে বলা চলে না। কথাটা প্রমীলার সামনে তুলেই ভুল হয়ে গেছে।

"ওটা ওনার একটা খেয়াল।" নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন মহেশবাবু।

"খেয়াল হলেই হল ? তোমার কি উচিত জানো ?" উষ্মা প্রকাশ পেল প্রমীলার কণ্ঠে।

"কি ?"

"শম্পাকে চাকরি না করে দেওয়া। উনি চাপে পড়লে ঠিক করবেন।"

মনে মনে হাসলেন মহেশবাবু। ও প্রসঙ্গে আর না যাওয়াই ভাল। শম্পাকে চাকরি না করে দিয়ে কতটুকু চাপ আর তিনি দিতে পারবেন জীবতোষবাবুকে।

গোটা দেশটা চাপ দিচ্ছে জীবতোষের মেরুদণ্ডটা ভেঙে দেবার জন্য। কিন্তু কোথায় যেন একটা শক্তি আছে জীবতোষের। নির্বিরোধী, ভালোমানুষ জীবতোষ প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে পড়েও কেমন যেন একটা শান্ত, ঋজু দৃঢ়তা নিয়ে অটল থাকেন। কোথা থেকে পান জীবতোষ এই শক্তি! আবছা শুনেছেন মহেশবাবু, জীবতোষের বাবার কাহিনী, দাদার কাহিনী। বোধহয় বহুবর্ষ আগেকার এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণের শুচিস্মিত চারিত্রিক দৃঢ়তা, উপাধ্যায়মশাই-এর প্রভায় আলোকিত করে, দীপশিখার মতো অন্তরে নিয়ে চলেছেন ওঁরা, বংশপরম্পরায়।

জীবতোষবাবুর প্রসঙ্গে না গিয়ে তাই তিনি প্রমীলাকে জবাব দিলেন, "শম্পাকে দেখলে আমাদের পুরোনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। আমি আর সমাজপতি হেদোর কাছে একটা ছোট ঘর ভাড়া করে থাকতাম। টিউশানি করে খরচ চালাতাম। এম.এ পাস করবই, এই ছিল আমাদের পণ। ওর অবশ্য এম.এস্‌সি। কতদিন গেছে·· থাক্ সে-কথা। ছাত্র-জীবনের সেসব দিনগুলোতে হয়তো অনেক দুঃখকষ্ট ছিল, কিন্তু আজ যেন সেই সব দিনগুলোকে কতো ভাল লাগে। মনে হয়, খাঁটি মানুষ ছিলাম—" বলতে গিয়ে আবার জিব কামড়ালেন। প্রমীলা যদি জিগেস করে বসে, কেন এখন কি আর খাঁটি মানুষ আছ বলে মনে হয় না।

প্রমীলা কিন্তু এবারে অত মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন না! অনেকবার এসব কথা শুনেছেন। মহেশ থামতেই বললেন, "তোমার খাবার দিতে বলব? রাত তো অনেক হয়েছে।"

"আচ্ছা, বল।" হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য কলতলায় যেতে যেতে মহেশবাবু বললেন।

"স্বপ্নাবেশে চলে একাকিনী আলোর কাঙালি"
—রবীন্দ্রনাথ

ঘুমটা আগেই ভেঙেছিল। জড়তা-ভরা তন্দ্রাটুকু ভাঙলো আলতো জলের ছাটের স্পর্শে। মাথার কাছে জানলাটা খোলা ছিল। শম্পা ঘুম-ঘুম চোখে তাকিয়ে দেখলো, ভোর হয়ে গেছে। আকাশটা মেঘলা বলে ঠিক-ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

মুখ ধুয়ে স্কুলে যাবার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিল শম্পা। আজই ওর কাজে যোগদানের তারিখ। এরই মধ্যে কাকীমা ওর জন্যে চা-জলখাবার তৈরি করে ফেলেছেন। কী দরকার ছিল এত ভোরে উঠে এসব করবার। একে তাঁর শরীর ভালো নেই। সে তো স্কুলেই চা খেয়ে নিতে পারতো। অনুযোগ করল শম্পা। কাকীমা কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে ওর চিবুকটা ছুঁয়ে একটু আদর করলেন।

রাস্তায় পা দিতেই ছোট্ট ছোট্ট জলকণা শম্পার চোখেমুখে এসে লাগল। কপালের কাছে, রুক্ষ চুলগুলোতে কয়েকটা বৃষ্টিবিন্দু মুক্তোর মতো আট্‌কে রইল। এলোমেলো সজল বাতাস মৃদুকম্পনে ওর শাড়ীর আঁচলটাকে দোলাচ্ছে। ভারী ভালো লাগছে শম্পার আজকের এই শহরের ভোরটাকে।

মেজকাকার ভাড়াটে বাড়ীর উনোনের ধোঁয়ায় এই ভোরটা ওর আবছা হয়ে ছিল এতদিন। গত তিন বছর ধরে, কলকাতায় পড়তে আসবার পর। ধুলো-ধোঁয়ায় ভরা শহরটাকে শম্পার খুব ভালো লাগে না। কিন্তু ও জানে আজকের এই ভোরটার মতো কয়েকটা অগোচর মুহূর্ত আসে কলকাতার জীবনে, যখন এই মহানগরী একটু যেন মুচকি হেসে নিজের মোহন রূপের কিরণ-সম্পাত করে লুকিয়ে পড়ে। শম্পা তক্কে তক্কে থাকে ওকে ধরবে বলে।

প্রায়-নির্জন গলিপথটায় ডেয়ারির একটা সাইকেলভ্যান চলেছে। দু'একজন দুধের ঘটি হাতে সামনে-দোয়া দুধ আনতে যাচ্ছে। শম্পাদের খবরের কাগজ-অলাটা সাইকেলে যেতে যেতে মৃদু হেসে দিদিমণিকে সেলাম জানিয়ে যায়। এবার থেকে ওকে একটা সাপ্তাহিক কি মাসিকপত্রিকা দিতে বলবে। সরু গলি। অল্প অল্প বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে গেছে। দু'সারি বাড়ীর ছায়া পড়েছে সেখানে। ঠিক মাঝখানটা জুড়ে মেঘলা আকাশের প্রতিবিম্বটা মাঝে মাঝে চক্‌চক্ করে উঠছে। সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে ভাবতে পথ চলেছে শম্পা।

অমরেশকে বললে ভালো হ'ত। কিন্তু বলবেই বা কখন? হাওড়া স্টেশনে দেখা হবার পর পরশু এসেছিল দশ মিনিটের জন্য। বাবু এত ব্যস্ত যে, দুটো কথা বলবারই ফুরসত হলনা। ওকে তো আর শুধু চাকরির খবরটা দিলেই চলবে না। কী চাকরি, কেন নিলে, এখনই কী দরকার ছিল নেবার, আগে জানালে না কেন, ইত্যাদি—ইত্যাদি; সব কৈফিয়ত দিতে হবে। সুবিধেমতো সব বুঝিয়ে বলবে এখন।

বাড়ীতেও জানায়নি। জানাবার খুব একটা দরকার নেই। বাবা কী ভাবে

নেবেন ঠিক তেমন বুঝতে না পারলেও, মায়ের কথা শম্পা জানে। কলকাতায় গিয়ে চাকরি করে মেয়ে টাকা পাঠাবে, মা ভাবতেই পারেন না। আর তাঁর কথায় কেউ কর্ণপাত করবে না, জেনেও তিনি একবার নিষেধের ঝড় তুলবেন। কলকাতায় মেজকাকা-কাকীমা মেনে নিয়েছেন ব্যাপারটাকে। তবে বোধহয় ঠিক মনে নিতে পারেননি। শম্পা বুঝতে পারে, মেজকাকার কোথায় আট্‌কাচ্ছে। শিবতোষ নিজের সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎটুকু বাঁধা রেখে দু'ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদেরও কষ্ট করতে হয়েছে, কিন্তু সংসারের ঝক্কি কোন দিনই পোয়াতে হয়নি, নিজের সংসার না-পাতা অবধি। শিবতোষ মাথার ওপর না থাকলে আজ হয়তো তাঁদের দু'ভাইকে শাসমল কিংবা দিন্দাদের কোন দোকান-টোকানে খাতা লিখে, কাজুবাদাম গাছে ঘেরা তাদের মহকুমা শহরটুকুর ছোট্ট গণ্ডীর ভেতর জীবন কাটিয়ে দিতে হ'ত। তার বদলে আজ তাঁরা দুভাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্তের সোপানে। কিন্তু দাদা আর ভবিষ্যৎটাকে ফিরে পাননি। তাঁর মেয়ে শম্পা—তাঁদের পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান—সে কিনা বি.এস্‌সি- পর্যন্ত পড়তেই তাঁদের সাহায্য পাবেনা! শম্পাকে পড়ানোর দায়িত্ববোধ জীবতোষের চিন্তাধারাকে কিছুটা বিপর্যস্ত করেছে, শম্পা তা বুঝতে পেরেছে।

তবুও ভাবালুতাকে প্রশ্রয় দেননি জীবতোষ; দাদার কথা ভেবেই। শম্পা নিজের পায়ে দাঁড়াতে না পারলে দাদার সংসারটা হয়তো ভেসে যাবে; কিংবা অনুতোষের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে টিঁকে থাকতে হবে। তার চেয়ে শম্পা চাকরি করুক। জলচৌকিটায় বসে বসে কাগজ পড়ছিলেন তিনি। শম্পা পায়ের কাছে বসে ছিল। ওর মাথায় হাত রেখে জীবতোষ তাই বলেছিলেন, "তা বেশ তো, চাকরি কর না মা। বাবার বয়স হয়েছে, তাঁকে তো দেখতেই হবে। তবে আমার কথা হচ্ছে কি, এবার তোর ফোর্থ ইয়ার। পড়াশোনা চালাতে পারবি তো?"

শম্পা ঘাড় নেড়েছিল।

সাধনা কিন্তু অত সহজে রাজী হননি। জীবতোষের কথা শুনে তিনি তো রেগে আগুন।

"কেন? কেন ও চাকরি করবে শুনি? এই যে বাদল এখানে থেকে পড়াশোনা করছে, তার জন্য ঠাকুরপো মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছে। তার কোন খরচ তোমাকে দিতে হচ্ছেনা। তবে একটা মেয়ের খরচ তুমি কেন দিতে পারবে না।"

সাধনা যেন অবুঝের মতো নীরব জীবতোষকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কতক্ষণই বা না-বুঝে থাকা যায়।

"বেশ, আমার বালা-জোড়া বার করে দিচ্ছি। এই ক'টা মাসের খরচ তাতে বেশ চলে যাবে। পরীক্ষার পর ও চাকরি করবে।" দৃঢ়কণ্ঠে বললেন সাধনা। শম্পা মুখ নীচু করে বসে ছিল—শাঁখাপরা কাকীমার শীর্ণ শুভ্র হাত-দু'খানির দিকে তাকিয়ে। বোধহয় ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। সাধনা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ওমা, তুই কাঁদছিস কেন? আমি তো তোকে কিছু বলিনি। এই দেখ মেয়ের রকম!"

শম্পা সচেষ্ট হবার আগেই ওর চোখের কোণে জমে-থাকা জলবিন্দুগুলি ঝরঝর করে গালের ওপর নেমে এসেছিল।

"ছি ছি, তুমি কী বল তো?" জীবতোষ অনুযোগ করে উঠলেন সাধনাকে, "বেচারা কত আনন্দ করে একটা কাজ করতে যাচ্ছে, আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ? এখনকার ছেলেগুলো, না করে পড়াশুনো, না করে কিছু কাজকর্ম। শুধু সিনেমা, আড্ডা, জলসা, ফাংশান! তার মধ্যে ও-বেচারা কত বুঝে-শুঝে চলে। আর তুমি কিনা—না, না, শোন্ শম্পা— তুই নিশ্চয়ই চাকরি করবি। আমি বলছি, করবি। দেখ, তুমি আর এই নিয়ে ওকে কিছু বোলো না।"

সাধনা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন। কাকীমার অবস্থা বুঝে শম্পা লজ্জা পেল। মনের অনেক বড় বড় আবেগ-উত্তেজনাকে দমন করতে পেরেছে শম্পা। কিন্তু কাকীমার বালা-জোড়া বিক্রির কথা শুনে, হঠাৎ ওর মনের ছোট্ট একটা আবেগকে কেন যেন প্রশমিত করতে পারল না। কিন্তু মেজকাকা-কাকীমার মনের ওপর ওর চোখের জলের প্রতিক্রিয়া দেখে, ও আরও লজ্জিত হয়ে পড়ল।

ক্লাসের ছোট ছোট মেয়েগুলো কী মজার। শম্পাকে কী জ্বালাতন করছিল। শম্পার ভীষণ হাসি পাচ্ছিল ক্লাসে গিয়ে।

"হোয়াট্টার ইউ ডুয়িং?

কানের পাশে গর্জন করে উঠলেন ডক্টর ব্যানার্জী। কখন উনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন. শম্পার খেয়াল নেই। কন্‌সেন্‌ট্রেটেড্ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে আন্‌নোন্ সল্ট্-টা দিয়ে সেটা বার্নারের ওপর চাপিয়ে, সকালের কথা ভাবতে ভাবতে শম্পার হাসি পাচ্ছিল! ডক্টর ব্যানার্জীকে দেখে, ও হেসে ফেলল।

ফোর্থ ইয়ারের প্র্যাকৃটিকাল ক্লাসের তদারকিতে এসেছেন উনি। গম্ভীরদর্শন, সব সময়ে তর্জন-গর্জনকারী বৃদ্ধ ডক্টর ব্যানার্জী ভারী ভালো-মানুষ! প্রথম প্রথম কী ভয় করতো শম্পার! কিন্তু, গম্ভীর ভাবটা কিছুতেই বেশীক্ষণ বজায় রাখতে পারতেন না উনি!

"কি স্যার বিচ্ছিরি একটা সল্ট্ দিয়েছেন, কিছুতেই সলিউশন্ হচ্ছে না।" আদুরে আদুরে গলায় বলল শম্পা।

"হোয়াই?" চোখ পাকিয়ে, পাকা হিটলারী গোঁফ জোড়ার ফাঁক দিয়ে বুক-কাঁপানো হুঙ্কার দিলেন ডক্টর ব্যানার্জী। তারপর সল্ট্-টার দিকে একবার দেখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বার্নারের ওপর চাপানো বীকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইয়েস্!" কিন্তু ততক্ষণে সত্যিই ভয়ে শম্পার মুখ শুকিয়ে গেছে। পাশের বেসিন্‌টায় অন্যমনস্কভাবে সে একটা ব্যবহৃত ফিল্‌টার-পেপার ফেলেছে, নীচের টুকরিটায় ফেলতে ভুলে গিয়ে।

"হুঁ! কোথায় গেল মেয়েটি?"

শম্পা ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে দেখল, পাশের সীটের শ্রীলতা বোধহয় কোনো রি-এজেন্ট্ আনতে জেনারেল্ ডেস্কে গেছে। ডক্টর ব্যানার্জী শ্রীলতাকেই দোষী ভেবেছেন।

"কোথায় স্যার গেল ওদিকে—" বলেই চট্ করে বেসিন্ থেকে ফিল্‌টার-পেপারটা তুলে নীচে ফেলে দিল।

"হুঁ! তা তুমি অনার্স্ ছেড়ে দিলে কেন? আর ছাড়বে নাই-বা কেন— দিনরাত শ্রীমান অরূপ-দেবেশদের সঙ্গে জলসা-ফাংশান হচ্ছে! দেবেশটা তো ঐ করেই গেল। ব্রিলিয়ান্ট্-স্কলার। আজকাল আবার শুনছি—" একটু ঝুঁকে পড়ে চুপি-চুপি বলতে চাইলেন, "পার্টি করছে, না?"

"না স্যার, ও রিসার্চ করছে।"

"হুঁ। বুঝেছি। তা তোমার ব্যাপারটা কি?" যেন সব জেনে ফেলেছেন এমনিভাবে জেরা করলেন ডক্টর ব্যানার্জী।

"সকালে স্যার, একটা স্কুলে চাকরি নিয়েছি তাই—" কুণ্ঠিত ভাবে বলল শম্পা।

"বটে!" কিরকম যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন ডক্টর ব্যানার্জী, "তাহলে তো ঠিক করেছ।" যেন অনার্স্ ছেড়ে শম্পা আরও ভালো ডিগ্রীর জন্য চেষ্টা করছে।

"একটু ভালো করে পড়—ডিষ্টিংশান্‌টা পাওয়া চাই। তারপর না-হয় পিওর কেমিষ্ট্রিতে একটা সীট যোগাড় করে দেওয়া যাবে। কেমন? অসুবিধে হলে, যেও আমার কাছে।"

শম্পা ঘাড় নাড়ল।

কেমিষ্ট্রিটা একরকম হল। কিন্তু ম্যাথামেটিক্‌স্‌-টা! বাদল আসছে না কেন?

"দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে পথ"

—রবীন্দ্রনাথ

বিকেলে কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে শম্পা দেখল, অনেকদিনের পরিচিত স্যুটকেসটা খাটের তলায় রয়েছে। খুশি হয়ে উঠল ও।

"কাকীমা, বাদল এসেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ রে। তুই কলেজ চলে যাবার একটু পরেই ও এলো।"

"গেছে কোথায়?"

"খাওয়া-দাওয়া করে বেরিয়ে গেল। বললে, শিবপুর যাচ্ছি।"

"শিবপুর! সেখানে কি?"

"তা তো জানি না। ওখান থেকে বোধহয় ওর মামার বাড়ী যাবে। আজ রাত্রে খাবেনা বলে গেছে। তুই চললি কোথায়?"

"ক্লাবে।"

সত্যিই অনেকদিন যাওয়া হয়নি। অরূপ-দেবেশ ওকে খেয়ে ফেলবে। রিহার্‌শাল্‌ পড়ে গেছে। অথচ ও একদিনও যেতে পারল না। কিন্তু এর পর তো ও মোটেই যেতে পারবে না। সকালে স্কুল, দুপুরে কলেজ, সন্ধ্যেবেলায় ভাইবোনগুলোকে নিয়ে বসতে হয়। তারপর নিজের পড়াশোনা।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতে শুনল, দেবেশের ঘর থেকে ভেসে আসছে—"বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে···" —শম্পা গুন্‌গুন্‌ করে উঠল।

ঘরে ঢুকতেই সরব অভ্যর্থনা।

"এই যে, আসতে আজ্ঞা হোক, বসতে আজ্ঞা হোক।"

অরূপটাই বেশি করে করছে। দেবেশ চুপচাপ। জেরা-কৈফিয়তের পালা কিছুটা চুকলে আবার গান-বাজনা শুরু হল।

দেবেশ অনীশের ঘরে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। মেয়েরা থাকলে, সাধারণতঃ রিহার্‌শাল্‌-ঘরে কেউ সিগারেট খায়না। দোতলায় দু'খানা ঘর; ঘরের সামনে একফালি ছাদ। ছাদের এককোণটা টিন দিয়ে ঘিরে রান্নার বন্দোবস্ত। দেবেশ আর অনীশ দুই বন্ধুতে ভাড়া নিয়ে আছে। দেবেশের ঘরেই সঙ্ঘের অধিবেশন বসে। মাঝে মাঝে অনীশের ঘরটাও জবরদখল হয়ে যায়। ক্ষীণকায়, ক্ষীণকণ্ঠ অনীশ হাই-পাওয়ার চশমার ফাঁক দিয়ে কাতরভাবে কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষার খাতাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। শম্পা এগিয়ে গিয়ে মৃদু হেসে ওর খাতার বাণ্ডিলটা বেঁধে তাকের ওপর তুলে দেয়।

দেবেশকে আজ একটু যেন চুপচাপ মনে হল শম্পার। তাই রিহারসালের মাঝখানে এ ঘরে উঠে এসে শম্পা দেবেশকে জিগেস করল, "কি ব্যাপার? এত চুপচাপ কেন?"

"ভাবছিলাম।" দেবেশ আলগোছে জবাব দিল।

"ভাবনার বিষয় বস্তুটা কি, জানতে পারি?"

ছদ্ম বিনয়ে শম্পা বলল।

"ক্লাবের ভবিষ্যৎ।"

"সে তো জানাই আছে। ঘোর অন্ধকার!"

"কেন?"

"নয়ই বা কেন? ক্লাবের একজন পাণ্ডা হসপিটালের ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে বসে ব্যাজার মুখে রোগী তাড়াবেন। আর একজন অফিসের ছাঁটাই কর্মীদের নিয়ে ট্রেড-ইউনিয়ানের লড়াই চালাবেন। এর মাঝে পড়ে বর্ষা উৎসবের নাচ-গান গুলো শেষ বর্ষনের মেঘের মত পালাই পালাই করবে। সুতরাং নাচ-গান যে বন্ধ হয়ে যাবে, এ আর নতুন কথা কি!"

শম্পার কণ্ঠে ছিল একটা ক্লিষ্ট সুর। ঠিক যে জীবনটা ওর মনের মত, আজ হঠাৎ তার থেকে সরে আসতে কিছুটা বাধ্য হচ্ছে বলেই ও বেশ বুঝতে পারছে, ওর জীবনটা ছিল একটা সুন্দর স্বপ্নের মত। স্বপ্নের ওপর বাস্তবের ছায়াপাতকে ও মেনে নিয়েছে। তবুও যে মাঝে মাঝে ভুল করে স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। তাই অরূপ আর দেবেশের ওপর অভিযোগের বোঝা কিছুটা চাপিয়ে ও এই বঞ্চনার যন্ত্রণা থেকে একটু রেহাই খুঁজতে চাইছিল।

শম্পার কণ্ঠের এই ক্লিষ্ট সুর স্পর্শ করে দেবেশকে। ও গভীর কণ্ঠে বলে ওঠে, "আমরা এখানে শুধু গান-বাজনা করবার জন্যই জুটেছি, তা তো নয়। সহজ সরল বন্ধুত্ব আমাদের জীবন থেকে একটু একটু করে হারিয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখ শম্পা? আমরা আজ যাদের সঙ্গেই মিশছি, সেই মেলামেশার মধ্যে কিছু না কিছু স্বার্থ এসে যাচ্ছে। শুধু মেশবার জন্য মেশা, এ যেন আমরা ভুলে গেছি। সেই সহজ মেলামেশাটুকুই আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা একদিন চেয়েছিলাম, আমাদের ক্লাবটা যেন তারই প্রতীক হয়ে গড়ে ওঠে।"

শম্পা জবাব দিল না। চেয়ারের হাতলটায় ভর দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ভাবতে লাগল, আজ হঠাৎ দেবেশ এসব কথা তুলল কেন।

কয়েকটা নিঃশব্দ মুহূর্ত। সিগারেটের হালকা ধোঁয়া একটু একটু করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পাশের ঘরে একক কণ্ঠে বিলম্বিত লয়ের একটা গান তোলা হচ্ছে।

দেবেশ মৃদু হেসে বলল, "দুজনের ঘাড়ে তো সব দোষ চাপালে। কিন্তু আর একজন যে মাথার ওপর ঘোমটা তুলে দিয়ে সংসারের কাজের মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রাখবে, তার কথা তো বললে না।"

শম্পা এতক্ষণে দেবেশের বক্তব্যের অর্থ খুঁজে পেয়েছে বলে মনে করল। অরূপও সেদিন ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছিল। তাই ও বলল, "তার সম্পর্কে কথাটা ঠিক নয়, কারণ সে ঐ ভাবে নিজেকে আড়াল করবে না।"

"অমরেশবাবুকে যতটা চিনেছি, তাতে ধারনাটা ঠিক বলেই মনে হয়।"

হঠাৎ যেন আলোচনাটার ওপর ছন্দ পতন ঘটে গেল। শম্পা সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সতর্ক করে নিল একটা পুরোনো আক্রমনের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য।

অরূপ, দেবেশ এদের সঙ্গে শম্পার আলাপ প্রায় ফার্স্ট ইয়ার থেকে, অর্থাৎ কলকাতায় এসেই। জীবতোষের ছাত্র সব। অমরেশের সঙ্গে শম্পার ঘনিষ্ঠতার খবর ওরা গোড়া থেকেই রাখত। প্রথম প্রথম ওরা অমরেশের নামে খুব নিন্দে করত শম্পার কাছে। অরূপটাই বলত বেশী, দেবেশ একটু চুপচাপ থাকত, মাঝে মাঝে ছোটখাটো সমর্থন জানাতো। শুনতে শুনতে শম্পা কৌতুক অনুভব করত।

তারপর যখন অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কটা স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন শম্পা ওদের কথা-বার্তা শুনলে একটু কৌতূহল বোধ করত। ভাবত, ওদের মধ্যে কি কিছুটা ঈর্ষার উপকরণ থেকে গেছে ? অরূপের আমুদে, হৈ-চৈ করা স্বভাবের জন্য শম্পা ওর কথা ততটা ভাবত না, যতটা ভাবত দেবেশকে নিয়ে। ওরা যে শম্পাকে নিয়ে অমরেশকে ঈর্ষা করে, এই গর্বটুকু মনের এক কোনায় ছোট্ট করে লালন করতে ভালো লাগত শম্পার। কৈশোর-যৌবন সন্ধিক্ষনের ভাবনাগুলো তাতে যেন একটু আবেশ-মদির হয়ে উঠত।

এ ভাবটা কিন্তু বেশীদিন বজায় রইল না শম্পার। তার প্রতি দেবেশের মনোভাবের ক্রমশঃ পরিবর্তন লক্ষ্য করতে করতে ও শঙ্কিত হয়ে উঠল। কোন দিন যদি দেবেশ কিছু বলে বসে! তাহলে তো দেবেশকে প্রত্যাখ্যানের বেদনা বহন করতে হবে। আর শম্পাই হবে সে যন্ত্রণার উপলক্ষ। একটা বিশ্রী অস্বস্তিতে ভরে গেল শম্পার মন।

ও চাইছিল, ওর সঙ্গে অমরেশের সম্পর্কটার আভাস ও অন্ততঃ দেবেশকে আগে ভাগেই দিয়ে রাখুক, যাতে দেবেশ আর নিজেকে প্রসারিত না করে।

সুযোগ একদিন এলো। দেবেশের ঘরে ওরা তিনজন জমায়েৎ। উপলক্ষ, সামনের কি একটা অনুষ্ঠান। আলোচনা শেষ হয়ে গেলেও বৃষ্টির জন্যে আটকা পড়েছে। সুতরাং আলোচনার বদলে তখন চলছে নিছক আড্ডা। ঘরোয়া কথাবার্তা। সহানুভূতি আর ঘনিষ্ঠতার আঁচে ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার কিছু কিছু খবর গলে বেরিয়ে আসছে প্রত্যেকেরই মনের অন্দরমহল থেকে। মনের যে সমস্ত কোমল দিকগুলো সযত্নে আড়াল করা থাকে, সে আড়াল ঈষৎ সরে সরে যাচ্ছে।

শম্পার কেমন যেন মনে হল, আজকের এই পরিবেশটা সহজেই দেবেশের বক্তব্যের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারে। ও একটু একটু করে কখন যেন নিজেকে তৈরী করে নিল।

অরূপ যখন হাসতে হাসতে বলল, আমাদের চেয়ে পরিবর্তনটা বেশী আসবে শম্পার ভাবী জীবনে, কেন না ছেলেদের চেয়ে মেয়েদেরই বিবাহিত জীবনে পরিবর্তনটা বেশী হয়, শম্পা তখন মৃদু হেসে বলল, "না, তা হবে না।"

"কেন ?" অরূপ জানতে চাইল।

"অমরেশের সঙ্গে সে বোঝাপড়া আমার হয়েই আছে। বিয়ের পর গান বাজনার এ আসর থেকে আমি সরে যাব না।"

দেবনাথ সচকিত হল।

অরূপ বলে উঠল, "অমরেশ বাবুর সঙ্গে ?"

"বারে," মৃদু হেসে কণ্ঠে অনুযোগের সুর এনে শম্পা বলল, "বিয়েটা যার সঙ্গে বোঝাপড়াটা তার সঙ্গে না করে কি অন্য লোকের সঙ্গে করব।"

শম্পা ধরেই নিয়েছিল, তার কথাটা বলার পরই অস্বস্তিকর নীরবতার কয়েকটা বিশ্রী মুহূর্তে তাদের সবাইকে পড়তে হবে।

কিন্তু দেবেশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "কনগ্র্যাচুলেশান্‌স্ !"

অরূপ শুধু বোকার মত কয়েক মুহূর্ত শম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, "শেষটায় অমরেশবাবুর সঙ্গে—"

শম্পা ওর দিকে স্মিত মুখে তাকাল।

এরপর থেকে অমরেশের নিন্দে করাটা ওদের কমে গিয়েছিল। আসলে হয়েছিল কি, ওদের নিন্দের মুখ্য বিষয়-বস্তুটা হত, অমরেশ কবে, কোথায়, কোন কোন মেয়ের সঙ্গে কি ধরনের ঘনিষ্ঠতা করেছে, তারই পল্লবিত কাহিনী। কিন্তু বেচারারা জানত না যে এর অধিকাংশ কাহিনীই শম্পা শুনেছে অমরেশের কাছ থেকে। যে কটা বাদ পড়ত, তাদের সম্পর্কে অমরেশকে জিগেস করলেই সে সেসব কাহিনী নিজের বিপক্ষে এমন রঙচঙে করে বর্ণনা করত যে কোথায় লাগে তার কাছে অরূপ দেবেশদের পল্লবিত ভাষণ। ফলে অমরেশ সম্পর্কে একই ধরনের সমালোচনা শম্পাকে আরও নিশ্চিন্ত করত।

তাই আজ বহুদিন পর অমরেশ সম্পর্কে দেবেশের মন্তব্য শুনে শম্পা শুধু বিস্মিতই হলনা, বিচলিত হল একটু। একবার ভাবল, ও নিজেই দেবেশকে প্রশ্ন করে, অমরেশকে ও কি এমন চিনেছে যাতে ওর এ রকম ধারনা হল যে বিয়ের পর অমরেশ শম্পাকে সংসারের আড়ালে আগলে রাখবে। কিন্তু কিছুই জিগেস করল না, শুধু আজকের আলোচনার ব্যঞ্জনাটুকু গভীরভাবে অনুভব করতে চাইল বলে।

তারপর দেবেশই হঠাৎ শম্পাকে জিগেস করে বসল, "আচ্ছা, অমরেশবাবু কি কার্সিয়াং থেকে ফিরেছেন ?"

"হ্যাঁ, ফিরেছেন।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"তা, হয়েছে বৈকি। কেন বল তো ?"

"না, তেমন কিছু নয়। মানে—," দেবেশ একটু ইতস্ততঃ করল।

"মানে—তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলেই কথাটা বলা যায়।" অরূপ বলল।

"আমিই বা শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন ?" শম্পা একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল।

"না, শুধু শুধু নয়। প্রসঙ্গটা অমরেশবাবু সংক্রান্ত এবং বিষয়টা অপ্রিয়। সুতরাং—"

দেবেশকে বাধা দিয়ে একটু কঠিন কণ্ঠে শম্পা বলল, "সুতরাং ও আলোচনাটা বন্ধ থাক্। পরনিন্দা বা পরচর্চাটা আমরা শরৎবাবুর যুগেই ফেলে এসেছি।"

দেবেশ ঠোঁটটা কামড়ে চুপ করে গেল। অরূপ শম্পার মনোভাবটা ঠিক বুঝতে না পেরে বলে উঠল, "না, না, আমরা মোটেই পরচর্চা করছি না। এতে তোমার স্বার্থ জড়িত আছে বলেই বলছি—"

কঠিন কণ্ঠে শম্পা উত্তর দিল, "কারুর অনুপস্থিতিতে তার নিন্দে করতে আমার রুচিতে বাধে। আর আমার ব্যাপার যদি কিছু হয়, তাহলে মনে রেখ, একজন ভদ্রমহিলার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করা তোমাদের শোভা পায় না।"

অপমানে অরূপের মুখটা কালো হয়ে উঠল। আর কোন কথা না বলে ও রিহারশালে চলে এলো।

শম্পা মনে মনে ভীষণ রেগে যাচ্ছিল। অমরেশের সঙ্গে শম্পার ঘনিষ্ঠতার কথা ওরা তো ভালোই জানে। তবুও কেন যে ওরা গ্রাম্য চেতনার অনুসরণে মাঝে মাঝে অমরেশের নিন্দে করবার চেষ্টা করে, শম্পা কিছুতেই বোঝে না। ওরা কি অমরেশের প্রতি তার মনোভাবটা ঠিকমতো মেনে নিতে পারছে না ? অথচ কোনদিনও খুব স্পষ্টভাবে অমরেশের নিন্দে করতে পারেনি, বা কোন প্রমাণ-প্রয়োগ উপস্থিত করেনি। তবুও শুধু শুধু ন্যাকামি করে - "তুমি যদি কিছু মনে না কর, তাহলে—তবে—হেন-তেন"—এসবগুলো কেন যে বলে !

"উঃ রাঙাদি, তোর সঙ্গে এবার দেখছি চিঠি লিখে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্‌ করতে হবে !"

বাদল বাড়ীর সামনে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। ডক্টর অনুতোষ গাঙ্গুলীর ছেলে প্রিয়তোষ, ওরফে বাদল।

"তোর মুখে একটি থাপ্পড় ! বাঁদর কোথাকার ! ভেতরে আয় ।"

দুজনে হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেল !

মাদ্রাজ থেকে অনুতোষ যেবার বদ্‌লি হয়ে জলপাইগুড়ি চলে এলেন, সেবার বাদল মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি থেকে আই. এস্‌সি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করল। বদ্‌লির নানারকম গণ্ডগোলের ফলে কলকাতায় আসতে দেরি হয়ে গেল। ফলে বাদল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে সীট পেলনা। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হল বটে, কিন্তু একই কারণে হোস্টেলে জায়গা পেল না। বাদলের মা বললেন, বাদল তাহলে মামার বাড়ী থেকেই পড়াশোনা করুক। অনুতোষের তাতেই রাজী হবার কথা। কিন্তু কি যে হল ! অনুতোষ বলে বসলেন, বাদল মেজদার বাড়ী থেকে কলেজে পড়ুক। আজকাল কলকাতার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বলে কোন জিনিস নেই। ডিসিপ্লিনের বালাই নেই। এদিক থেকে মেজদা অত্যন্ত স্ট্রিক্‌ট। ওঁর কাছে থাকলে বাদলের সুবিধে হবে। ব্যাপারটা বাদলের মায়ের মনঃপুত না হলেও, তিনি আর এ নিয়ে কথা বাড়াননি।

মাসে মাসে বাদলের খরচের জন্য অনুতোষ টাকা পাঠাতেন জীবতোষের নামে। বাদল এবারে সময় মতো ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অ্যাড্‌মিসান্ টেস্ট দিয়েছিল। পাস করেছে। সুতরাং দু'একদিনের মধ্যে হোস্টেলে চলে যাবে।

জানলার পাশে বসে বসে শম্পা শুনছিল বাদলের কথা।

"ওমা, তুই তাহলে চলে যাবি ! আমি বলে ভাবছিলাম—" শম্পা থেমে যায়।

"কী ভাবছিলি রে রাঙাদি ?"

"না, সে কিছু নয়। আচ্ছা, তুই মাঝে মাঝে আসবি না ?"

"হ্যাঁ, আসব না কেন। বল্ না কী ?"

"ইন্‌টিগ্রাল্ ক্যাল্‌কুলাস্‌টা বেশ শক্ত লাগছে রে। অনার্সে তোরা তো ওটা থার্ড ইয়ারে করেছিস ?"

"হ্যাঁ, তা করেছি।"

"তাহলে শোন্। তুই রোববারে-রোববারে চলে আসবি, বুঝলি ? কো অর্ডিনেট জিয়োমেট্রি আর ইন্‌টিগ্রাল্ ক্যাল্‌কুলাস্‌টা তাহলে তৈরি করে নেব ।"

"অনার্সটা ছেড়ে দিলি কেন রে রাঙাদি ?"

"দূর ! আমাদের মাথায় কি ওসব ঢোকে !"

"বাজে কথা বলিস না। তুই একেবারে বিনয়ের অবতার হয়ে গেছিস। আজকাল আবার চাকরি নিয়ে তোর খুব গ্র্যাভিটি বেড়েছে। হ্যাঁ রে, চাকরি করতে খুব মজা, না রে? আমি যে কবে চাকরি করব!"

শম্পা মুচকি হেসে বলল, "তুই একদম ছেলেমানুষ!"

বাদল ভেংচি কেটে বলল, "ইস্, তুই যেন একেবারে ঠাকুমা হয়ে গেছিস!"

"হয়ে গেছিই তো।"

"তাহলে অমরেশদা তোকে ডিস্কার্ড করে দেবে।"

শম্পা গুম করে বাদলের পিঠে একটা কীল মারল।

"উঃ, গেছিরে! হ্যাঁরে রাঙাদি, অমরেশদার খবর কী রে!"

"দেখ্ বাদল, আমি তোর দিদি, সেটা মনে রাখিস!"

"সে তো তুই-ই মনে রাখতে দিচ্ছিস না। খালি পোজ্ করছিস, যেন আমার দিদিমা।"

"আবার!" শম্পা এবার বাদলকে জোরে চিম্টি কাটল।

"ওরে, লাগছে, লাগছে, ছাড়্, ছাড়্,—আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলব না। উঃ!"

চিম্টি-কাটা জায়গাটায় হাত বোলাতে বোলাতে বাদল বলল, "হ্যাঁরে রাঙাদি এবারে তোদের সেসব জলসা-ফাংশান হবে না? সেই যে—কি যেন সংস্কৃতির ধ্বজা তোরা বয়ে নিয়ে চলেছিস—"

"হ্যাঁ হবেই তো।"

"তাহলে এবারে কিন্তু আমাকে একটা ভালো রোল দিবি। ওসব বাজনা-ফাজনা নয়। বুঝলি? দেখবি, ফাটিয়ে দেব।"

"এবারে কী ফাটাবি? দেবেশের তবলা?" শম্পা হেসে জিগেস করল।

বাদল হো-হো করে হেসে উঠল। ওর মনে পড়েছে।

গতবার বর্ষামঙ্গল হবার আগে অনীশের অসুখ করল। তাই কিছুদিনের জন্য রিহার্শাল হল জীবতোষের বাড়ীতে। বাদলের সেবার কী উৎসাহ। ত্রিপল টাঙানো থেকে শুরু করে আর্টিস্ট আনা, তানপুরা ঘাড়ে করে আর্টিস্টদের পেছনে দৌড়নো, সিঙাড়া সন্দেশের ব্যবস্থা করা, মায় হুইস্‌ল দিয়ে ড্রপসিন লা পর্যন্ত বাদল সব দিক সামলাত। রিহার্শাল যখন চলত, বাদল তখন কাণে বসে ঢুলত। গানের মাঝখানে হঠাৎ ঢুলুনি থামিয়ে আড়মোড়া গা উঠত। দুটো তুড়ি দিত। তারপর হাই তুলতে তুলতে অরুপের

পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে গম্ভীর ভাবে জিগেস করত—"এটা বেহাগ না পিলু, অরূপদা ?" 'ওহে সুন্দর মরি মরি'—গানটা গাইছিল অরূপ। গান বন্ধ করে, বাদলকে এই মারে আর কি! বাদলের কোন খেয়াল নেই। সে জিগেস করেই আর একবার ঘুমোবার উদ্যোগ করে বলল, "কাকীমা চা নিয়ে এলে ডেকে দিস্ রাঙাদি।" কোরাস গানের সময়, ও হঠাৎ গলা মেলাতে লেগে গেল। কোনদিকে দৃক্‌পাত নেই। শম্পা ওকে থামাতে পারে না। সেবারে দেবেশকে অনেক খোসামোদ করে একটা তানপুরা ঘাড়ে নিয়ে বসে গেল। দেবেশ ওকে বেশ ভালোভাবে দেখিয়ে দিল। তারপর বলল, একটু যদি এদিক-ওদিক করবি তো, গাঁট্টা খাবি। ওর ফুর্তি দেখে কে! খানিকটা বাজাবার পর ওর মাথায় নোট্, ফ্রিকোয়েন্সি, বিট্‌স্, ল্যজ্ অফ্ ভাইব্রেশন, অর্থাৎ আই.এস্‌সি. ক্লাসের সাউণ্ডের বিদ্যেটা গজগজ করে উঠল। ওর মনে হল, একটা তারের টেন্‌শান্ কমে যাওয়ায় ভাইব্রেশান্ যা হচ্ছে, তাতে ফ্রিকোয়েন্সিতে নিশ্চয় কিছু গণ্ডগোল হচ্ছে। 'টি ইকোয়াল টু' কত যেন! দরকার নেই, তার চেয়ে টেন্‌শানটা বাড়িয়ে দিলেই তো হাঙ্গামা চুকে যায়। বাস্, যেই না ভাবা, অমনি কাজ। তানপুরার কানেতে বেশ করে মোচড। সঙ্গে সঙ্গে পড়াং। দেবেশ গান থামিয়ে যেই-না ওর দিকে তাকিয়েছে, অমনি "দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি, কাকীমা ডাকছে" বলেই চম্পট।

"তুমি যেন এক পরদায়-ঢাকা-বাড়ি
আমি অঘ্রান-শিশিরে-সিক্ত হাওয়া"
—বিষ্ণু দে

অমরেশ অবাক হয়ে চুপচাপ বসে ছিল। একটু আগে বাদল কলেজে চলে গেল ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিতে। ওর কাছেই শুনল, শম্পা স্কুলে কাজ নিয়েছে। ফিরতে প্রায় দশটা সাড়েদশটা হবে। জীবতোষবাবুও স্কুলে যাবার সময়ে অমরেশকে অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। হাতটা একটু খালি হতে সাধনা অমরেশের জন্য চা আর পাঁপর ভাজা নিয়ে এলেন। দাঁড়িয়ে দুটো ঘরের কথা বলে গেলেন। অমরেশের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গেল। কিন্তু শম্পা তখনও ফিরল না। সাধনা আর একবার এসে

বলে গেলেন, শম্পার আজ একটু বেশী দেরী হচ্ছে। এত দেরী ওর হয় না। কি হল আজ কে জানে।

অমরেশ একটু ক্ষুব্ধ হয়েছে। শম্পা চাকরি নিল, অথচ তাকে জানাল না! অবশ্য শম্পা যা করবে তাই তাকে জানিয়ে করবে, এটা সে মোটেই ভাবছে না। শম্পার চাকরি নেওয়ার ব্যাপারটা টাকাকড়ি সংক্রান্ত বলেই অমরেশ ভাবছে। কতদিন-আর আগে হবে, বোধহয় বছর দেড়েক—গত শীতের আগের শীতে—যেবারে বীথি ওকে একটা সোয়েটার বুনে দিয়েছিল—এবারে সেটা গায়ে দেয়নি বলে বীথি ক্ষুণ্ন হয়েছিল--হ্যাঁ দেড়বছরই হবে! অমরেশ এসেছিল জীবতোষের সঙ্গে দেখা করতে। জীবতোষ বাড়ী ছিলেন না। তখনই ফিরবেন শুনে অমরেশ এই ঘরে বসেই কাগজ পড়ছিল। মৃদু পদশব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল শম্পা এসে দাঁড়িয়েছে। এর আগেই শম্পার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তার সহজ সপ্রতিভতায়।

"আমার একটা কাজ করে দেবেন?"

"কী কাজ?" অনুসন্ধিৎসু অমরেশ একটু অবাক হল।

"এইটা বিক্রি করে কিছু টাকা আমায় দিতে হবে।"

শম্পা একগাছি চুড়ি এগিয়ে দিয়েছিল অমরেশকে। চুড়িটা নিতে নিতে অমরেশ আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখেছিল শম্পার প্লাষ্টিকের চুড়ি পরা হাত দুটোর দিকে। এ বাড়ীতে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন এর আগেও হতে হয়েছে [illegible]কে। সা[illegible]। তাই খুব একটা অবাক হল না।

"টাকাটা কাল এনে [illegible]বে?" অমরেশ সহজ গলায় প্রশ্ন করেছিল।

প্রশ্ন শুনে শম্পা আশ্বস্ত হল। তার আশঙ্কা ছিল, অমরেশ তাকে হয়তো নানারকম প্রশ্ন করবে; অন্তত কাকীমা জানেন কিনা, এটা তো একবার জিগেস করবেই। তখন বাধ্য হয়ে শম্পাকে বলতে হবে, না। তাহলে কি অমরেশ রাজী হবে? কিন্তু কাকীমাকে তো জানানো চলতে পারে না। পাঁচ মাসের মাইনে আর পরীক্ষার ফী একসঙ্গে জমা দিতে হবে শুনে, সে বাবাকে চিঠি লিখেছিল। বাবা লিখেছেন, টাকাকড়ির যা দরকার পড়ে, মেজকাকার কাছে চেয়ে নিও। চিঠিটা কাকীমার হাতে দিয়ে দিলেই চলত। তার পরের কাজগুলো শম্পার মুখস্থ। কাকীমা ট্রাঙ্কের ওপর থেকে স্যুটকেসটা নামাবেন। ট্রাঙ্ক খুলে গয়নার বাক্সটা বার করবেন, তার অনেকগুলো শূন্য খোপ উল্টে-

পাল্টে হয়তো দু'এক কুঁচি সোনা বার করবেন, যা হাবলু-কাবলুর অসুখের জন্য তোলা আছে। দরকার নেই। কলকাতায় আসবার সময় মা নিজের হাত থেকে খুলে দু'গাছি চুড়ি পরিয়ে দিয়েছিলেন। তারই একটার সদ্‌গতি হোক।

এইসব ভেবেই শম্পার একটু সঙ্কোচ ছিল, অমরেশ কী বলবে। অমরেশ কিন্তু এসব প্রশ্নের ধার দিয়েও গেল না। এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের মন কিরকম নার্ভাস হয়ে যায়, জানা আছে তার। সে শুধু জানতে চাইল, চুড়িটা বাঁধা দেবে না বিক্রী করে দেবে।

"বাঁধা দিলে কিরকম পাওয়া যায় ?"

"অর্ধেক দাম।"

একটু ভাবল শম্পা। ছোট্ট একটু হিসেব।

"না থাক্। আপনি বিক্রিই করে দেবেন।"

"বেশ।"

চুড়িটা খবরের কাগজের টুকরো দিয়ে মুড়ে পকেটে রাখল অমরেশ। তারপর যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে জিগেস করল, "হঠাৎ টাকার দরকার পড়ল যে ?"

"পরীক্ষার ফী জমা দিতে হবে।"

আগে যেন কিছুই বোঝেনি। এতক্ষণে সব বোঝার ভান করে অমরেশ বলল, "ও! তা বটে।"

অমরেশ অবশ্য চুড়িটা নিজের কা[illegible] রেখেই টাকাটা এনে দিয়েছিল। হয়তো চুড়িটা শম্পার বলেই এ দুর্বল[illegible]কে প্রশ্রয় দিতে ওর ভালো লেগেছিল।

পরীক্ষা দিয়ে বাড়ী ফেরবার সময়ে কিন্তু সাধনা গণ্ডগোল বাধিয়ে বসলেন।

"ওমা। একি কাণ্ড তোর! দিদি কী ভাববেন বল্ তো ? চুড়িটা ভেঙে ফেলেছিস ? তবে হারিয়ে গেছে ? কই আমাকে তো কিছু বলিসনি ?"

বাধ্য হয়ে শম্পাকে খুলে বলতে হয়। সব শুনে মৃদু হেসে সাধনা বলেন, "পাছে কাকীমার যা দু'এক-কুচো পড়ে আছে, সেগুলো যায়, তাই নিজের চুড়িটা দিয়ে দিলি! তা বেশ করেছিস। কিন্তু এই বয়েস থেকে হাত-খালি করতে শুরু করলে, আমাদের বয়সে যে দু'এক কুচোও থাকবেনা রে ?"

অমরেশ এলে একবার জিগেস করলেন।

অমরেশ আশা করেনি, সাধনাকে শম্পাই জানিয়ে দেবে। তাই তাকে,

একটু হিসেব করে বলতে হল, "হ্যাঁ। তবে আপনি জানেন কিনা জানিনা তো। তাই ওটা আমার কাছেই রেখে দিয়েছি।"

"ও। তাই নাকি! তা বেশ—মানে—"

"শম্পা তো কাল বাড়ী যাচ্ছে। আমি কাল ওটা এনে দেব'খন।"

"না, না, তা কখনও হয়? সুবিধে হলেই ওর বাবা টাকাটা পাঠিয়ে দেবেন। তখনই ওটা ফেরত দিও।"

"না, কাকীমা," মৃদু হেসে খানিকটা যেন অনুযোগ করেই অমরেশ বলল, "ওটা তো আমার আর শম্পার ব্যাপার। আপনি কেন এর মধ্যে আসছেন?"

সাধনা একটু অপ্রতিভ হয়ে হেসে বললেন, "বেশ।"

পরদিন অমরেশ শম্পাকে বলল, "দেখ, তুমি তো বাড়ী যাচ্ছ। অনর্থক মা-বাবাকে চিন্তিত কোরোনা। এটা রেখে দাও।" চুড়িটা দিতে গেল অমরেশ।

শম্পা বিস্মিত হয়ে বলল, "সেকি! আপনি বিক্রি করেননি চুড়িটা।"

"আমার নিজেরই তো এর ব্যবসা রয়েছে। বাইরে কেন বিক্রি করবো?"

"কিন্তু কিনে নেবার পর জিনিস ফেরত দিয়ে আপনি ব্যবসা করেন নাকি?"

"কী বিপদ!" যেন উষ্মা প্রকাশ করল অমরেশ, "তোমার সঙ্গে যা করেছি, তা কি সবাইর সঙ্গে করব?"

"কেন? আমার প্রতি এ ধরনের পক্ষপাতিত্বের হেতু?"

বলে ফেলেই শম্পা নিজের ভুল বুঝতে পারল। কথাটা বলে অমরেশকে বেশ একটা সুন্দর সুযোগ করে দেওয়া হল নাকি? এরপর অমরেশ কি বলবে!

"এর কারণ হল, পৃথিবীতে এমন দুচারজন লোক থাকে যাদের কিছুতেই দূরে ঠেলে রাখা যায় না। তাদের এত ভালো লাগে যে চট করে কাছের মানুষ করে পেতে ইচ্ছে করে," অমরেশ থেমে একবার শম্পার দিকে তাকালো, "দেখ শম্পা, তোমাকে তাদের দলেই ফেলতে ইচ্ছে করে। কথাটা সোজাসুজি বলে ফেললাম বলে কিছু মনে কোরো না। তোমাকে ভালো লাগে বলেই এরকম করেছি।"

শম্পা নিস্তব্ধ। অনেকটা এই ধরনের কিছুই যেন ও আশঙ্কা করছিল।

অমরেশ কিন্তু একটু আগেও শম্পাকে এধরনের কথা বলবে, ভাবতে পারে নি।

সারা সকালটা ওর কেটেছে ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ে বীথি চ্যাটার্জিকে গীটার শেখাতে। বীথি সুন্দরী, ধনীকন্যা, মার্জিত রুচি, ম্যানার্স পটিয়সী। তার একটা সহজ আকর্ষণ আছে, যাকে ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়ে অমরেশ ভেবেছে, চার্মিং, শিম্‌প্লি চার্মিং। ওর কাছে অনেক কথাই অনর্গল বলা যায়। এমনকি মনের সব কথাই নিঃসঙ্কোচে খুলে বলা যায়। শুধু সেগুলো ম্যানার্স সম্মত হলেই হল।

তাই আজ সারা সকাল বীথিকে গীটার শেখাতে গিয়ে তার কানের কাছে অমরেশ অনেক গুণগুণ করেছে। কিন্তু স্পষ্ট করে কোন ঘনিষ্ঠতার কথা উচ্চারণ করতে পারে নি। কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকেছে। সঙ্কোচ বোধ করেছে, যদি রীতি-সম্মত বা রুচি সম্মত না হয়। অথচ কতদিন ধরেই [illegible] বলবে-বলবে করছে।

কিন্তু না ভেবেই কত স্পষ্ট করে, সহজ করে কথাটা শম্পাকে বলে ফেলল। অবশ্য এরকম ভাবে বলল বলেই এটা যে একটা কথার কথা, তা কিন্তু অমরেশের মনে হল না। মনের গভীর থেকে স্বতোৎসারিত শব্দের মতই কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিল। বলবার সময়েই অমরেশ বুঝতে পারছিল, কথাগুলোর মধ্যে এতটুকু ফাঁকি নেই। বীথির ছায়া এতটুকু এসে পড়ে নি সে শব্দস্রোতের ওপর। হয়তো অনেকদিন ধরেই শম্পার ভাবনা তিল তিল করে অমরেশের মনের গহনে মানসী মূর্তি সৃজনে সাহায্য করে চলেছে, টের পায়নি অমরেশ। শম্পার সহজ, সরল, সাবলীল ভাব তাকে যেন অনেক সময়েই অবাক করেছে। ভালো লাগিয়েছে। হয়তো মনের কোন এক কোণে অস্পষ্ট হয়ে ছিল শম্পাকে ভালো-লাগাটা, যে মনটা আধো-আধো, বাঁকা-বাঁকা, হেঁয়ালীতে ভরা কথা, প্রচুর ন্যাকামি আর প্রচুরতর অঙ্গভঙ্গী পছন্দ করে না।

কিন্তু শম্পা! প্রথম পুরুষের মুখে তাকে ভালো লাগার মর্মবাণী! যেন বয়ঃসন্ধির কামনা-কুঁড়ির বুকে শিরশির করে লাগল হাওয়ার পরশ। গুনগুন করে কে যেন মনের অন্তঃপুরে গেয়ে উঠল, ভালো লাগে—ভালো লাগে—শুনতে ভালো লাগে। হঠাৎ নিজের কাছে নিজে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জায় শরম রাঙা হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। ধরা পড়ে যাওয়ার একটা মধুর আবেশ ওকে যেন জড়িয়ে ধরতে থাকল। কিন্তু না, ও যে আর ধরা দিতে চায় না। কেমন যেন একটা সব হারাবার শঙ্কায় ও শঙ্কিত হয়ে উঠল। মনের ভাবটা

গোপন করবার চেষ্টা করল যথাসাধ্য। অতল জলের কত উচ্ছ্বাস সমুদ্রপৃষ্ঠে শান্ত সংযত তরঙ্গ ভঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে উঠল।

কলকাতায় পড়তে এসে অনেক ছেলের সঙ্গেই শম্পার আলাপ হয়েছে। মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে বলা চলে অরূপ আর দেবেশের সঙ্গে। কিন্তু অমরেশের সঙ্গে না ঘনিষ্ঠতা, না অপরিচয়। পরিবারের আর পাঁচজনের মতো ওর সঙ্গেও শম্পার স্বাভাবিক সম্পর্ক। মনের তো আর লাগাম থাকে না; যা খুশী তাই ভাবা চলে। আগস্টের টিপ্ টিপ্-বৃষ্টি-ঝরা বিকেলে তক্তা-পোশে গা এলিয়ে শম্পাও তাই অনেক আবোল-তাবোল ভেবেছে। তাতে অমরেশ বাদ পড়েনি। কিন্তু এই ভেবেই শম্পা ওসব ভেবেছে যে, এই ভাবনাটা ওর একটা বিলাস মাত্র। প্রকৃত জীবনের ক্ষণিক ছায়াপাতও তাতে নেই।

তাই হঠাৎ অমরেশের ভালো-লাগার কথাটা শুনে বুকটা দুরদুর করে উঠলেও, সেটাকে সে যেন আমলই দিতে চাইল না। কিন্তু কিছু তো একটা বলা দরকার। তার আগেই কিন্তু অমরেশ বলে বসল, "দেখ আমার একটা ভয় আছে। তুমি যা জেদী মেয়ে, ফস্ করে ভেবে বসবে, আমি হয়তো তোমার আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তোমাকে করুণা করতে চাইছি। তাই আগেভাগেই বলে রাখছি, ওসব কিছু নয়। তোমার প্রতি কোন কারণে করুণা হলে তা চেপে রাখবার মতো ভদ্রতাবোধ আমার আছে।"

শম্পা অনেকটা এই ধরনের কিছু একটা ভাবতে যাচ্ছিল। অমরেশের কথা শুনে একটু শুষ্ককণ্ঠে বলল, "তবে আবার এটা ফেরত দিচ্ছেন কেন?"

"অন্ততঃ এটুকু তুমি বুঝবে বলে যে চুড়িটা ফেরত দেওয়া মানে ধারটা অস্বীকার করা নয়। সেটা সুবিধে হলে দিয়ে দিও।"

কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল শম্পা, এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে তার ইচ্ছে ছিল না।

শম্পার হাতে চুড়িগাছা দেখে সাধনা একটু আশ্বস্ত হয়ে ভেবেছিলেন, তাঁর এই চমৎকার ভাসুরঝিটির হয়তো একটা ভালো ঘরে-বরে পড়বার একটু ক্ষীণ আশা রইল।

তারপর বাড়ী থেকে ফিরেছে শম্পা।

বি এস্‌সি. ক্লাসে ভর্তি হয়েছে একগাদা টাকা দিয়ে। অনেক টাকার বই কিনতে হয়েছে। অমরেশের কাছে ধারের পরিমাণটাও বেড়েছে। অমরেশ

ওকে টিউশানি যোগাড় করে দিয়েছে। বিভিন্ন সময়ে পাশে থেকে বন্ধুর মতো সাহায্য করেছে। ওদের সম্পর্কও অনেকটা সহজ হয়ে এসেছে।

শম্পা ফিরল, তখন প্রায় এগারোটা। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকাল অমরেশ। শম্পার ফরসা মুখটা রোদের তাপে লাল হয়ে উঠেছে। কপালের কাছে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। কয়েকটা চুল উড়ে এসে সেখানে আটকে রয়েছে। বেশ একটা পরিশ্রান্তির ছাপ শরীরে। হাতে এক বাণ্ডিল খাতা। অমরেশ মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখতে লাগল।

শম্পা ওকে দেখে একটু হাসলো। বলল, "এতক্ষণ ধরে বসে থাকতে হয়েছে বলে চটেছো তো ?"

"চটেছিলাম। কিন্তু এই মুহূর্তে আর চটে থাকতে পারছি না।"

"কেন ?"

"তোমাকে দেখে।"

"যা—ও !" সলজ্জ ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে খাতার বাণ্ডিলটা টেবিলের ওপর রাখল শম্পা। তারপর আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে এগিয়ে এল অমরেশের কাছে।

"তোমার ব্যাপারটা কি ? আমাকে কিছু না জানিয়ে—"অমরেশ কথাটা শেষ করল না।

শম্পা সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল। ক'দিন ধরেই ও ভাবছিল অমরেশকে কী বলবে।

শম্পাকে নীরব দেখে অমরেশ বুঝল, তাকে না জানিয়ে কাজটা নেওয়ার জন্য শম্পা যথেষ্ট সঙ্কুচিত। তাই কথাটাকে ও একটু ঘোরাবার চেষ্টা করল।

"আমাকে জানানো মানে একটা হয়তো টিউশানি দেখে দেওয়া যেত। এরকম একটা ভারী কাজ পরীক্ষার আগে নিলে !—তাই বলছিলাম কি—মানে —আমাকে আগে জানালে কি ভালো হত না ?"

"না নিলে আর চলছিল না।"

"কেন। মানে, কামীমা কই তেমন তো কিছু—মানে—"

অমরেশ একটু অবাক হল। কারণ, জীবতোষের পরিবারের আর্থিক আবহাওয়ার খবর ওর কাছে অজানা থাকত না।

নিরহঙ্কার, সদালাপী, সহানুভূতিশীল এই ছেলেটিকে মনের মত শ্রোতা পেয়ে সাধনা তার সঙ্গে ঘর সংসারের অনেক কথাই কইতেন। তাছাড়া

অভাব-অভিযোগে অমরেশের সাহায্য তো লাগতই। তাই অমরেশ ধরে নিয়েছিল, যে আর্থিক অসুবিধেয় পড়ে শম্পা চাকরী নিয়েছে, সে অসুবিধেটুকুর আভাস ওর আগে-ভাগেই পাবার কথা।

তাই শম্পা যখন জবাব দিল, "না। এখানে নয়। দেশে।"– ওর তখন খেয়াল হল। ঠিক বটে, সে তো ভুলেই গিয়েছিল, শম্পার দেশ আছে। বাবা-মা, ভাই-বোন, ইত্যাদি নিয়ে দেশে শম্পার আর একটি অভাবের সংসার আছে। সে যেন ধরেই নিয়েছিল, শম্পা জীবতোষবাবুদের পরিবারেরই একটি মেয়ে। কিন্তু আর একটি পরিবার কোন্ অলক্ষ্য থেকে শম্পার মনোজগতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। সেটা অমরেশ কোনদিনই ভেবে দেখেনি। তাই অনেক দিনের চেনা জীবতোষবাবু ও সাধনাদের পরিবারে থাকা এই মেয়েটি যখন মাঝে মাঝে কেমন যেন বিচিত্ররূপে প্রতিভাসিত হয়ে উঠত, তখন অমরেশ অবাক হয়ে তাকাত।

শম্পা অমরেশের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাড়িটা এখন প্রায় নিরিবিলি। সাধনা পারতপক্ষে এখন আর এ-ঘরে আসবেন না। অমরেশ আস্তে আস্তে শম্পার হাতটা ধরে বলল, "শম্পা! বাড়ীতে তুমি যে-টাকাটা পাঠাতে চাও, সেটা আমাকেই পাঠাতে দাও না। আমার ওপর তোমার কী কোনো দাবি, কোনো অধিকার নেই।"

অমরেশ ভাবছিল, শম্পা দ্রুত হাতটা ছাড়িয়ে নেবে। যত ঘনিষ্ঠতাই করুক, শম্পা খুব একটা কাছে আসতে চাইত না। অথচ বীথির হাতটা ধরে কাছে টানলেই ও কতো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। লেখাপড়া জানা, সুন্দরী, বড়লোকের মেয়ে। অথচ কোন অহঙ্কার নেই। ও যেন অমরেশের হাতে ধরা দিয়েই আছে। আর শম্পার মধ্যে কোথায় যেন একটা অহঙ্কার লুকিয়ে আছে। শম্পার কাছে আসতে গেলে মনে হয়, ও যেন নীরব অনুজ্ঞা প্রচার করে রেখেছে, আমার কাছে আসতে গেলে এই পথ ধরে আসতে হবে। শম্পার এই নীরব অহঙ্কারটুকুই অমরেশের বিচিত্র বলে মনে হয়।

কিন্তু শম্পা হাতটা ছাড়ল না। আস্তে আস্তে বলল, "তোমার ওপর আমার যে দাবি, যে অধিকার, তার ওপর ভিত্তি করেই তো আমার যখন যা দরকার পড়ে, তোমাকে বলি। কিন্তু সেই অধিকারের দাবিতে আমার সংসারের বোঝা কোনদিনও তোমাকে বইতে দেব না। বিয়ের পরও আমাকে চাকরি করতে হবে, এই জন্যে।"

অমরেশ শম্পা আর বীথি দুজনকে পাশাপাশি রেখে অনেক ভেবেছে। না ভেবেও তার উপায় ছিল না।

আর্থিক এবং সামাজিক পদমর্যাদার দিক থেকে অমরেশ বীথিদের সম-গোত্রীয়। তাদের বিয়েটা তাই সকলেরই অভিপ্রেত। বীথিকে গীটার শেখাতে আসা যে আলাপের উপলক্ষ্য এবং প্রণয়ের পূর্বাভাস, এ কথা ব্যারিষ্টার চ্যাটার্জিরা ধরেই নিয়েছেন। সমাজে কোর্ট-শিপ প্রথাটা ঠিক আনুষ্ঠানিকভাবে চালু নেই বলেই, ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে কিছু একটা উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে নিতে হয়। যদি অমরেশ-বীথির পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা প্রণয়ের পরিণতিতে পৌঁছতে না পারে, তাহলে ব্যারিস্টার দম্পতি নিশ্চয়ই একটু ক্ষুন্ন হবেন। কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। তাঁরা আবার নতুন উৎসাহে নতুন পাত্রের সঙ্গে বীথির আলাপের উপলক্ষ্য সৃষ্টির চেষ্টা করবেন।

এ কথা অমরেশ জানে।

কিন্তু জীবতোষের পরিবারে অমরেশ মিশেছে, তার মনের প্রসারতায়। এতে কোন সন্দেহ নেই। অকৃত্রিম ব্যবহারে সে যেমন সবাইকে সহজে আপন করে নিতে পেরেছে, তেমনি জীবতোষেরাও অর্থসঙ্গতির প্রতি নিম্ন মধ্যবিত্তদের স্বাভাবিক সঙ্কোচ মনের দৃঢ়তায় জয় করে নিয়েছে। তা হলেও কিন্তু শম্পার সঙ্গে অমরেশের বিয়ের প্রস্তাব তোলা সাধনাদের পক্ষে সহজ নয়। অতি সহজেই সেখানে এক পক্ষের দীনতা এবং আর এক পক্ষের করুণা অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। সাধনাকে তাই অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য ধারণ করতে হয়, সম্মানজনক একটা পরিণতিতে আসবার জন্য। একটি একটি করে তার আশার পাপড়িগুলি নিজেদের মেলে ধরতে চায়। কিন্তু কোন কারণে সে-আশা মুকুলিত না হলে সে নিশ্চয়ই ভেঙে পড়বে, শম্পার ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

শম্পার সঙ্গে প্রাথমিক ঘনিষ্ঠতার প্রতিটি পদক্ষেপে অমরেশ ছিল অত্যন্ত সতর্ক। পাছে কোন কারণে সাধনাদের বা শম্পার আত্মমর্যাদা ক্ষুন্ন হয় সেদিকে ছিল তার তীক্ষ্ণ নজর। অথচ বীথির সঙ্গে সে মিশেছে অত্যন্ত নিঃসঙ্কোচে। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি যে এখনও রেফ্রিজারেটার কেনেন নি, কিংবা গত গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে বিনা রুমকুলারে কলকাতায় থাকবার মতলব করেছিলেন—এ সব নিয়ে অমরেশ অতি সহজে হাসি-ঠাট্টা করতে পারে বীথির সঙ্গে। এমন কি বীথির জন্মদিনের পার্টিটা এবারে যে তেমন জুৎ হয় নি, তার একমাত্র কারণ

মিসেস চ্যাটার্জির হিসেবী মন—এনিয়ে অমরেশ বীথিতে মিসেস চ্যাটার্জিকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর নামে অনেক অভিযোগ অনুযোগ উপস্থিত করেছে। অথচ শম্পার কোন নোটবই কেনা হয় নি শুনলে ও এমন সীরিয়াসভাবে ওসব প্রসঙ্গে কথা বলেছে যে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অর্থাভাব নিয়ে কোনদিন এত গভীরভাবে কথা বলেছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এটা ভান নয়। অমরেশ নিজের মনের মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে। কোথাও এতটুকু ফাঁকি নেই। শম্পার সঙ্গে তার ব্যবহার উদ্দেশ্য পূর্ণ বা স্বার্থ পূর্ণ নয়। বরং একাগ্র আন্তরিকতায় ভরা।

বীথি তাকে ভাবায় নি। যে ধরনের মেয়েরা অমরেশদের সমাজে চলে, ও ঠিক তাই। ওকে বিয়ে করে খুব সহজেই সুখী হওয়া চলে। ও সকালে উঠে ব্রেকফাষ্টের টেবিল সাজাবে, কাজে বেরোবার আগে অমরেশের হাতে হাতে স্যুট-টাই এগিয়ে দেবে। সন্ধ্যেবেলায় মোটর ড্রাইভিং-এ পাশে সঙ্গিনী হবে। খাবার টেবিলে অনর্গল কথা বলবে। আর রাত্রে অমরেশের আদরের কাছে অতি সহজেই আত্মসমর্পণ করবে।

শম্পা কিন্তু অমরেশের কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছে; ভাবিয়েছে ওকে। শম্পাকে বিয়ে করলে অমরেশের দাম্পত্য জীবন কি রকম হবে, এ নিয়ে অমরেশ কৌতূহলী হয়েছে। বীথির সঙ্গে পাশাপাশি রেখে যখনই ভেবেছে, তখনই বুঝেছে, শম্পাও ঘর সংসারের কাজ করবে, সেবা-প্রীতি-ভালোবাসায় তাকে ভরিয়ে রাখবে, তার কল্যাণ হস্তের স্পর্শ পড়বে অমরেশের জীবনে। হয়তো শম্পা চাকরী করবে। কিন্তু এইটুকু পার্থক্যই শুধু তার বীথির সঙ্গে নয়। শম্পা যদি হুবুহু বীথির মতই জীবন ধারণ করে, তাহলেও দুজনের মধ্যে একটা বিরাট পার্থক্য অমরেশের চেতনায় খুব সহজেই ধরা পড়বে। সেটা হল. অমরেশ তার সমস্ত জীবন মন দিয়ে অনুভব করে শম্পার সত্তা। শম্পার যে একটা পৃথক নারী সত্তা আছে. সে অমরেশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেও, তার স্বাতন্ত্র্য যে অটুট থাকবে, একথা অমরেশ বোঝে।

তাই বীথিকে নিয়ে অমরেশের ভাবনা হয় না। সারাদিনের কাজ কর্মের মধ্যে বীথির কথা তার একবারও মনে পড়ে না। হয়তো কখনো কখনো কোন মেয়ের সঙ্গে তুলনা দেবার দরকার পড়লে বীথিকে মনের মধ্যে টেনে আনে। অমরেশ জানে, বীথিকে বিয়ে করলেও, এই চিন্তাধারার কোন ব্যতিক্রম হবে না। হয়তো বীথি অসুস্থ থাকলে, সারাদিনের কাজ কর্মের ফাঁকে উদ্বিগ্নচিত্তে

একবার ডাক্তারকে ফোন করবে। অথচ ওর ঘরে গিয়ে পড়লে অমরেশ বিনা আয়াসেই ওকে নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে পারে। তখন যেন সমস্ত জগৎ ওর ঘরের দরজায় আটকে পড়ে থাকে। হাসিতে, গল্পে, গানে, কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়, বুঝতে পারে না অমরেশ। বীথি ছাড়া যে আর কিছু তার জীবনে থাকতে পারে, একথা অমরেশের মনেই পড়ে না। এমন কি, শম্পারও তখন এ ঘরে প্রবেশ অধিকার থাকে না। অমরেশ ভাবে শম্পার ভাবনা যেদিন চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে এ ঘরে ঢুকে পড়বে, সেদিন তার মনোজগতে এলোমেলো বিশৃঙ্খল হাওয়ার যে ঝড় উঠবে, তার হাত থেকে তার আত্মরক্ষার উপায় থাকবে না।

অথচ এই সময়টুকু বাদ দিলে শম্পা তাকে সব সময়েই ভাবায়। শম্পার চেতনা যেন সুরার মত তার সমস্ত সত্বাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সারাদিনের সমস্ত কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সে ভাবে শম্পাকে, তার জীবনকে, তার জীবনের বিভিন্ন সমস্যাকে। যখনই সে শম্পার কোন কাজ করে তখনই যেন কর্তব্য-কর্মের একটা সুন্দর অনুভূতি ওর মনটাকে অনুরণিত করে তোলে।

শম্পা কোনদিন অমরেশকে আপন গণ্ডীটুকুর মধ্যে আবদ্ধ রাখে না। বরং শম্পার কাছে গেলে একটা অচেনা জগতের আভাস যেন শম্পার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে আসে।

মাঝে মাঝে অমরেশের লোভ হয়, শম্পার ভাবনা এক একদিন বীথির ঘরের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ঢুকে পড়ুক না। আসুক না সংঘর্ষ। দেখাই যাক না, কে জেতে!

শম্পা ঠিক অমরেশদের সামাজিক গোত্রভুক্ত নয়। ওর পরিবেশটা যেন আলাদা। তাইজন্য কি শম্পাকে বিচিত্র মনে হয়। কিন্তু তাহলে তো একদিন ওকে জানা হয়ে যাবে, চেনা হয়ে যাবে ওর পরিবেশকে। সেদিন ও ওর সমস্ত বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলে এক সাদামাটা মেয়ের বেশ ধরে হাজির হবে অমরেশের চোখের সামনে। তাই অমরেশ অনেকদিন ধরে লক্ষ্য করছে। দেখছে, শম্পাকে কিছুটাও অন্তত জানা বলে মনে হয় কিনা। কিন্তু পরিচয় যত গভীর হচ্ছে, ততই তো মনে হচ্ছে শম্পার মনোজগতে কি এক অসীম রহস্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শম্পাই তার সমস্ত সত্বাকে একটু একটু করে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

কিন্তু অভ্যাসটা আছে। তাই বীথিও আছে। সারাদিনের কিছুটা খণ্ড

অবসর এখানে নির্ভাবনায় কেটে যায়, হালকা ছেলেমানুষীতে। এখানে গভীর জলে ডুব দেওয়া নেই। আছে অল্প গভীরতায় জলবিহার। এ দুর্বলতাটুকু এখনও পরিহার করতে পারে নি অমরেশ। শম্পাকে তৈরী করতে পারে নি তার এই জীবনের সঙ্গিনীরূপে। তাই শম্পার কাছে গোপন রেখেছে এই দুর্বলতার প্রসঙ্গটুকু। বহু মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ বা ঘনিষ্ঠতার কাহিনী শম্পাকে জানাতে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে নি অমরেশ। অবশ্য সেটা শম্পার মানসিক কাঠামো দেখেই। বুঝেছে অন্য মেয়ের সঙ্গে বাহ্যিক ঘনিষ্ঠতা শম্পার মধ্যে বিন্দুমাত্রও চাঞ্চল্য আনয়ন করে না। কিন্তু অন্তর্লোকে শম্পার চারিত্রিক শুচিতা অত্যন্ত দৃঢ়। আর ও অমরেশের কাছ থেকে আশা করেও তাই। তাই বীথির কথা অমরেশ বলতে পারে নি, এক যদি ঘনিষ্ঠতার সুরুতে বলে নিতে পারত, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তখন না বলার ফলে, ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোপন রাখার অপরাধটা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। শম্পার বিশ্বাস প্রবণতায় গভীর ধাক্কা লাগবার ভয়ে অমরেশ বীথির সঙ্গে তার বাহ্যিক ঘনিষ্ঠতার কথাই হাসি-ঠাট্টার অলঙ্কারে পরিবেশন করেছে।

এখনও শম্পার স্মৃতি মনের এক কোণায় সযত্নে লালন করে, বীথিকে বিয়ে করে, তাকে অবসর সঙ্গিনী রূপে নিয়ে, মোটামুটি নিস্তরঙ্গ সুখেই জীবন কাটিয়ে দিতে পারে অমরেশ। কিন্তু শম্পাকে বিয়ে করলে বীথি ওর মনের কোণায় ঠাঁই পাবে না। শম্পা পুরুষের অবসর-সঙ্গিনী হতে পারে না। সে নারী, আপন সত্তায় সে অটুট আস্থাশীল, অখণ্ড জীবনবোধের সে প্রকৃত অংশীদার।

৭

"প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য"

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন ধরে যে অস্বস্তির কাঁটাটা শম্পার মনের মধ্যে বিঁধেছিল, অমরেশকে কাল সব-কিছু বলার পর সেটা নেমে গেছে। তাই বাদলের সঙ্গে আজ বিকেলে সিনেমায় যাবার জন্যে তৈরি হতে হতে ওর নিজেকে খুব হালকা মনে হয়েছিল। এমনকি সারা দুপুর চেষ্টা করে প্যারাবোলার একটা অঙ্কও যে কষতে পারেনি, তার জন্য মনটা একটুও খচখচ করছিল না। তাই দরজায়

কড়া নাড়ার শব্দ পেতেই, ও দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, "তুই কী রে বাদল ? এত দেরি করলি !"

কিন্তু বলে ফেলেই চমকে উঠল। একি ! বড়দি দাঁড়িয়ে ! মানে, হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ মালতীমালা রায়।

শশব্যস্তে শম্পা তাঁকে অভ্যর্থনা করল, "একি, বড়দি ! আসুন ভেতরে ! সত্যি, আমি তো ভাবতেই পারছি না।"

হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ যেন অপার করুণার হাসি হেসে ঘরে এসে বসলেন।

"এদিকে কোথায় এসেছিলেন বড়দি ?"

"আমার পুরোনো মাস্টারমশাই মহেশবাবুর বাড়ী।"

"ও ! উনি তো আবার আমাদের কমিটির সেক্রেটারি।"

হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ ও-কথাটায় তেমন একটা গুরুত্ব না দিয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ঘরের চারদিকটা দেখতে লাগলেন।

"আপনি আমার বাড়ী চিনলেন কি করে বড়দি ?"

"মহেশবাবুর কাছেই জেনে নিলাম।"

সাধনার করা একটা টেবল-ক্লথ্‌ মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে করতে জবাব দিলেন মালতীমালা রায়। শম্পা কৃতার্থ হবে কিনা, অন্ততঃ হওয়া উচিত কিনা, ভেবে ঠিক করতে পারল না। হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ বাড়ী চিনে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন !

সাধনা এসে পড়ে আলাপ করলেন। শম্পাকে ইঙ্গিতে জিগেস করলেন, চা-টা করবেন কিনা।

শম্পা জিগেস করল, "বড়দি, একটু চা—"

"রক্ষে করো, এই গরমে আর চা পোষাচ্ছে না।"

শম্পা হাত-পাখাটাকে আরো একটু জোরে টানবার চেষ্টা করল। যদিও গরম খুব একটা নয়, তা হলেও ঘেমে গেছেন। একটু মোটা মানুষ কিনা।

সাধনা চলে যেতে হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ বললেন, "শম্পা, এবারে আমি উঠি।"

ব'লে চেয়ার থেকে না উঠেই আবার বলতে শুরু করলেন, "হ্যাঁ, ভালো কথা, কাল তোমাকে সায়েন্সের যে-বইগুলো সিলেক্ট্‌ করতে বলেছিলাম, সেগুলো করেছিলে ?"

"হ্যাঁ, বড়দি। লিস্ট্‌টা করে আপনার টেবিলে রেখে দিয়ে এলাম। তাই জন্যে কাল বাড়ী ফিরতে আমার দেরি হল। কেন, আপনি পাননি সেটা ?"

"পেয়েছি। কিন্তু আমি তোমাকে ক্লাস নাইন্-এর যে-বইটা দেখতে দিয়েছিলাম, কই সেটা তো লিস্টে দাওনি।"

"সে বইটা—বড়দি—মোটেই ভালো হয়নি। প্রথমতঃ সিলেবাসের মতো লেখা হয়নি। মনে হয় ভদ্রলোক সিলেবাস না জেনেই লিখেছেন। তা ছাড়া বাঙলাভাষায় এখন বিজ্ঞানের বেশ ভালো বই বেরিয়েছে। বইটার ভাষা এত বাজে—"

"থামো তুমি!" বিরক্ত হয়ে বাধা দিলেন উনি, "পড়ছো তো ভারী বি. এস্‌সি., এরই মধ্যে তুমি যেন বই সিলেক্‌শানের ব্যাপারে মহা মাতব্বর হয়ে গেছ।"

অপমানে শম্পার কানের পাশ দুটো গরম হয়ে উঠল।

"তাহলে আপনি নিজেই বই সিলেক্ট্‌ করলে পারতেন।"

"তাইতো করব।" পরম দাক্ষিণ্য-ভরে বললেন মালতীমালা রায়, "তুমি বিজ্ঞান পড়াবে, তাই তোমাকে দিয়েই যেন করালাম—এই জন্যেই তোমাকে দেখতে দেওয়া, আর কি।"

"বাজে-বই হওয়া সত্ত্বেও আপনার বন্ধুর বই বলে সেটা স্কুলে চালাবেন!" শম্পাও একটু খোঁচা দেবার চেষ্টা করল, "ঐ বই পড়তে গেলে মেয়েদের অসুবিধের কথাটা আপনি ভাবছেন না।"

পরম ঔদার্যভরে মালতীমালা রায় হাসলেন, "তুমি এখনও ছেলেমানুষ, শম্পা। ও বই মেয়েরা কেউ পড়বে না। তারা পড়বে নোট। সুতরাং ওদের দিয়ে যে-কোন বই কেনানো চলতে পারে। হ্যাঁ, ভালো কথা, মনে পড়েছে। তুমি এখনই ক্লাসের মেয়েদের নোট কিনতে বোলো না। আমি বোধহয় একখানা নোট লিখব।"

"বোধহয় লিখবেন মানে?"

"কস্‌বায় যে জমিটা কিনেছিলাম, সেখানে বাড়ী তুলতে শুরু করে দিয়েছি। সিমেন্টের পারমিট্‌টা যদি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাই, তাহলে আর নোট লিখব না, আর ওটা পেতে দেরি হলে, টাকাটা ভাবছি একটা নোট পাব্‌লিশ করে খাটিয়ে নি'। তাই বলছিলাম, মেয়েদের এখন নোটের কথা না বলতে।"

"আমি ঠিক করেছি, মেয়েদের আমি নোট পড়তে বারণ করে দেব। নিজেই সাহায্য করব ওদের।" বেশ নির্বিকার ভাবেই বলল শম্পা।

"জানি তা।" বলে উঠে পড়লেন মালতীমালা রায়; "আমি সন্দেহ

করেছিলাম, তুমি মিস্ চ্যাটার্জি—আই মীন্—কোন একজনের পরামর্শে আমার বিরোধিতা করছ। সে-কথা আমি মহেশবাবুকে বলেওছি। এবার আমার সে-সন্দেহ দৃঢ় হল। আর এটাও মহেশবাবুকে জানাতে হবে।"

মালতীমালা রায় বেরিয়ে গেলেন। শম্পা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল। মহেশবাবুর কানে কথাগুলো তোলা হতে পারে শুনে ওর একটা বিশ্রী অস্বস্তি শুরু হল। ন্যায়-অন্যায় বলে নয়, মহেশবাবু তাকে চাকরি করে দিয়েছেন, তার যাবতীয় ঝামেলা মহেশবাবুকে পোয়াতে হবে, এটা ঠিক নয়। তা ছাড়া মহেশবাবু কাকাবাবুর বন্ধু এবং শম্পাকেও অত্যন্ত স্নেহ করেন। ছি ছি, তিনি যে কী ভাবছেন!

বাদলের ডাকে চমক ভাঙলো শম্পার।

"কী রে রাঙাদি! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি!"

"এত দেরি করলি কেন? চ'।"

বাদলের সঙ্গে বেরোতে-বেরোতে শম্পার মনে হল বাদলটা আর একটু আগে এলে ভালো হত। বেরিয়ে গেলে আর বড়দির সঙ্গে দেখা হত না। তাহলে অন্ততঃ আজ সত্যজিৎবাবুর ছবি দেখতে যাওয়ার সময় নতুন করে অস্বস্তির কাঁটা বেঁধার হাত থেকে রেহাই পেত। হঠাৎ ওর মনে পড়ে গেল, মহেশবাবু আজ সকালে অরূপকে পাঠিয়েছিলেন জীবতোষবাবুকে একবার দেখা করবার জন্য বলতে।

অরূপ হস্‌পিটাল-ডিউটি সেরে সোজা বাড়ী ফিরল। বাইরের ঘরটায় মহেশবাবু স্কুল কমিটিতে অভিভাবকদের প্রতিনিধি নরেনবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলেন। মহেশবাবু অরূপকে দেখে জিগেস করলেন, ও জীবতোষবাবুকে খবর দিয়েছে কিনা। অরূপ ঘাড় নেড়ে ভেতরে চলে গেল।

মহেশবাবু তখন নরেনবাবুকে বললেন, "এবারের কমিটি-মীটিং-এ আপনি পুজো-বোনাসের কথাটা তুলবেন।"

নরেনবাবু বললেন, "সে তো নিশ্চয় তুলব। এখন আমার ছেলেটার একটা ব্যবস্থা করে দিন। ও-যে এবারে ক্লাস-প্রমোশান পেল না।"

মহেশবাবু তিক্ত কণ্ঠে বললেন, "কি করে পাবে বলুন? ওর বাবা হেড-মাস্টারের বিরুদ্ধে দল পাকাচ্ছে! আর তিনি ওকে প্রমোশান দেবেন?"

মহেশবাবুর উষ্মা দেখে নরেনবাবু হেসে ফেলে বললেন, "এ আপনি কী বলছেন ?"

মহেশবাবু চটে গিয়ে বললেন, "আপনি হাসতে পারেন। কিন্তু হেড-মাস্টারমশাই যে কী চীজ্, তা আপনাদের অনেকেরই এখন জানা নেই। আমি অবশ্য কাদা ছেটাতে চাই না। As an humble educationist, আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আপনার ছেলেকে আমার কোচিং-এ পাঠিয়ে দেবেন। আমি ওকে অঙ্কটা দেখিয়ে দেব।"

নরেনবাবু খানিকটা বিগলিত হয়ে বললেন, "সে তো খুব ভাল কথা। আমি কাল থেকেই ওকে পাঠিয়ে দেব। আজ তা হলে উঠি।"

"আসুন। হ্যাঁ, ভালো কথা। আপনার ছেলেকে ভজহরিবাবুর কাছে ইংরিজি পড়তে পাঠান না ?"

"ওকে তো সত্যবাবুর কাছে ইংরিজি পড়তে দিয়েছি।"

"ও।" একমুহূর্ত ভাবলেন মহেশবাবু, "আমি খুব দুঃখিত। আপনার ছেলেকে অঙ্ক কোচ্ করবার ভার অন্য কাউকে দেবেন।"

"সেকি !" নরেনবাবু রীতিমতো অবাক হয়ে পড়লেন, "এইমাত্র আপনার সঙ্গে কথা হল—"

"তা হল হয়তো", বেশ গম্ভীর ভাবেই জবাব দিলেন মহেশ, "তবে ভজহরিবাবুর কাছে ইংরিজি পড়তে না দিলে, আমার পক্ষে অঙ্ক কোচ্ করা সম্ভব হবে না।"

"তাই নাকি !" হতভম্ব নরেনবাবু জবাব দিলেন, "মানে—সত্যবাবুর খুব নাম শুনে খোকাকে গতবছর থেকেই ওখানে দিয়েছিলাম কিনা। আর এবারেও ইংরিজিতে বেশ ভালোই পেয়েছিল। শুধু—"

"শুধু অঙ্ক ইতিহাস আর ভূগোলে ফেল। হুঁ ! বুঝলেন নরেনবাবু, পড়ানোর সুখ্যাতি কিসে হয় জানেন, ছাত্র পাস করল কিনা তার ওপর।"

"সে তো বটেই।"

"আর ছাত্র পাস করে, জানা কোশ্চেনের উত্তর লিখে। তা জানেন ?"

"সে কি ?"

"সত্যবাবুর কোচিং-এর কোন ছাত্রই ইংরিজিতে ফেল্ করে না, আর সত্যবাবু ইংরিজির পেপার সেট্ করেন।—এ-দুটোকে একসঙ্গে জড়িয়ে ভাবুন।"

"আপনি কী বলছেন !"

"বলছি ঠিক কথাই। তা নইলে আর ওর কোচিং-এর ছাত্র শুধু ইংরিজিতেহ পাস করে, আর বাদ বাকী সব সাব্জেক্টে ফেল্ হয়ে যায়! যাক্, আপনি যা ভালো বোঝেন, করবেন। As an humble educationist আমার offer আপনাকে দেওয়া রইল।"

কিছুটা উত্তেজিতভাবে মহেশবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নরেনবাবু কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু সচেতন হয়ে দেখলেন, অরূপ তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এতক্ষণে যেন একটা অবলম্বন পেলেন, এমনিভাবে অরূপকে বললেন, "বুঝলে বাবা, আজকাল ছেলেগুলোই হয়েছে, অতি বদ। পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক নেই। বছর বছর ফেল্; আর আমরা স্কুলে গিয়ে হেড-মাস্টারমশাই এর ঘরের সামনে দেড়ঘণ্টা ধরে লাইন দিয়ে প্রমোশানের ব্যবস্থা করি। হতভাগা সব, অতি হতভাগা! তা এবারে তো তাও পারলাম না। আর হবে কোত্থেকে। স্ত্রীকে ডেকে বললাম, খোকাকে একবার মাস্টারমশাই-এর বাড়ী যেতে বল। উনি বললেন, খোকা আমার পকেট থেকে দশ-আনা পয়সা নিয়ে ওকে ব'লে 'বোম্বাই কা গুণ্ডে'-তে লাইন দিয়েছে। কাণ্ড শুনেছ! যত জ্বালা হয়েছে আমাদের।"

বলতে বলতে নরেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

অরূপ ওঁর গমনপথের দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ আগে কয়েকখানা বই নিতে ও এ-ঘরে ঢুকেছিল। হঠাৎ সত্যবাবু সম্পর্কে বাবার কথা কানে যেতে, অবাক হয়ে ও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। সত্যবাবুর কোচিংক্লাসে নিজেও পড়েছে। কিন্তু কই, এরকম ব্যাপার তো কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না।

অরূপ মাথা নীচু করে পায়চারি করছিল। মহেশবাবু ঘরে ঢুকে একটা টেস্ট-পেপার ও কতকগুলো খাতা নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।

অরূপ ডাকল, "বাবা!"

মহেশবাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে অরূপকে দেখে বললেন, "ও। খোকা? কিছু বলবে?"

"হ্যাঁ—মানে—" ইতস্ততঃ করতে লাগল অরূপ।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মহেশবাবু।

"আপনি সত্যবাবু সম্পর্কে যে সব কথা বললেন—মানে যে সব অপবাদ—"

"অপবাদ!" তীব্রভাবে বাধা দিলেন মহেশবাবু, "তোমার কি মনে হচ্ছে, একজন সহকর্মীর প্রতি আমি মিথ্যে দোষারোপ করছি?"

মহেশবাবুর উত্তেজনা দেখে অরূপ বিব্রত বোধ করল।

"না, তা নয়, মানে—আমিও তো ওঁর কাছেই পড়েছি। কই কখনও তো—"

"তার পর দেশটা অনেক তাড়াতাড়ি বদলে গেছে।"

গম্ভীরভাবে কথাটা বলে যেন প্রসঙ্গটার ইতি করতে চাইলেন মহেশবাবু।

অরূপ কিন্তু তিক্ত কণ্ঠে বলে ফেলল, "তাই বুঝি আজকাল দল পাকিয়ে ছেলে পড়াতে হয়।"

কথাটা বলে ফেলেই অরূপ চমকে উঠল। ছি, ছি, কথাটা এরকম ভাবে না বললেই চলত।

মহেশবাবু চশমাটা খুলে চাদরের খুঁট দিয়ে মুছতে মুছতে শান্ত কণ্ঠে বললেন "ওটা তোমাদের কাছ থেকেই শেখা।"

"আমাদের কাছ থেকে!" বিস্মিত হল অরূপ।

"হ্যাঁ।" নিরুত্তেজিত কণ্ঠ মহেশবাবুর "এ যুগে তোমরা তো সবাইকেই সংঘবদ্ধ হয়ে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সংগ্রাম করতে পরামর্শ দাও। আমরাও না হয় একটু দলবদ্ধ হলাম, আমাদের শ্রেণী-স্বার্থের খাতিরে।"

"কিন্তু দলবদ্ধ হওয়া আর দলাদলি করা কি এক?"

"আমার ছাত্র শঙ্কর চোপরার বাবার মোটরের কারখানায় যেবার ধর্মঘট হল, সেবার ওদের একটা ইউনিয়ান ধর্মঘট ভেঙে দিতে চেয়েছিল। তুমি আর দেবেশ তখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের হয়ে যে-কাণ্ডটা করেছিলে, সেটাকে কি দলাদলির পর্যায়ে ফেলা যায়না?"

অরূপ অসহিষ্ণু হয়ে জবাব দিল, "কিন্তু সেটা যে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার, বাবা। ও তরফের ইউনিয়ানটা ছিল মালিকদের পেটোয়া।"

"এখানেও আর-একটা দল কর্তৃপক্ষের অনুগৃহীত। কারোর extra increment পাস হয়ে যায়। কারোর বা unjustified Provident Fund Loan পাস হয়ে যায়। আর খুব বেশী ঘনিষ্ঠ হলে তো কোশ্চেন-পেপারের প্রুফ দেখবার সুবিধে পায়। ফলে, বাকী টীচারেরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যই দল বেঁধেছে।"

"ছি, ছি, এ আপনি কি বলছেন! স্কুলের মধ্যেও যদি এত রাজনীতি ঢোকান, এত নোংরামি ঢোকান, তাহলে দেশের মধ্যে সুস্থ আবহাওয়া বজায় থাকবে কি করে?"

এবারে উত্তেজনা দমন করতে পারলেন না মহেশবাবু, "সুস্থ আবহাওয়া বজায় রাখবার দায়িত্ব কি শুধু অত্যন্ত-কম-মাইনে পাওয়া স্কুল-মাস্টারদের?

অধ্যাপক, ডাক্তার, এরা যখন টাকার গদীতে বসে রাজনীতিতে নামেন, তোমরাই তখন এঁদের প্রগতিবাদী বলে মাথায় তুলে নাচো। ভেবেও দেখ না, এমনি করে, কলেজে হাসপাতালে বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে রাজনীতির বাষ্প ঢুকলে, দেশের আবহাওয়া কলুষিত হয় কিনা। আর গরীব স্কুল-মাস্টার, ছ'বেলা ছ'মুঠো ভাতের জন্য যদি একটু রাজনীতি করে থাকে, অমনি দেশ জুড়ে 'গেল' 'গেল' রব। এই তোমাদের বিচার!"

অরূপ বলতে যাচ্ছিল, তার মানে আপনি বলতে চান, ন্যায়-অন্যায় বোধ বিসর্জন দিয়ে, শুধু নিজের স্বার্থ টুকু নিয়ে পড়ে থাকলেই চলবে। তাহলে আর পকেটমারদের সঙ্গে তফাত হল কোথায়। কিন্তু বলবার আগেই লক্ষ্য করল, মহেশবাবু বেশ হাঁপাচ্ছেন ; চোখ-ছুটো মাঝে মাঝে বুজিয়ে ফেলছেন। আর যেন একটা কিছু ধরবার চেষ্টা করেছেন।

অরূপ চট্ করে বুঝে গেল, প্রেসারটা হঠাৎ বেড়েছে। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে মহেশবাবুর হাতটা ধরে বলল, "বাবা, আপনি একটু শুয়ে পড়বেন চলুন।"

মহেশবাবু যেন একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, "না, না, আমার তেমন কিছু হয়নি।"

অরূপ ওঁকে জোর করে শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল ; আলোটা নিভিঁয়ে পাখাটা চালিয়ে দিল। প্রমীলা দৌড়ে এসে ভয়ে ভয়ে অরূপকে জিগেস করলেন, "ব্যাপার কী।"

অরূপ বলল, "স্কুল সম্বন্ধে কথাবার্তা বলতে বলতে হঠাৎ উনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। প্রেসারটা তাই একটু বেড়ে গেছে।"

বাস্, আর যায় কোথায়! রাগে গরগর করতে করতে প্রমীলা চাপা স্বরে বললেন, "পই পই করে বারণ করেছি, দিনরাত ইস্কুল-ইস্কুল করে মাথা খারাপ কোরো না। আর না করেই বা করেন কি! তোমাদের স্কুলের হেড-মাস্টার-মশাই, সত্যবাবু এঁরা নাকি আজকাল আর কিছুই দেখেন না। কমিটি তাই ওঁকে স্কুলের অনেক কিছু দেখতে দিয়েছেন। কি-যে করবেন উনি!"

অরূপ তিক্ত কণ্ঠে বলল, "বাবা স্কুলের ব্যাপার যত কম দেখেন, ততই ভালো।" বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরের ঘরে এসে দেখল জীবতোষবাবু মহেশবাবুর জন্যে অপেক্ষা করছেন। মহেশবাবুর অসুস্থতার কথা শুনে জীবতোষ ব্যস্তভাবে উঠে পড়ে বললেন, তিনি তাহলে কাল আসবেন।

আস্তে আস্তে একটা চেয়ার টেনে অরূপ বসে পড়ল। কিরকম যেন একটা বিশ্রী ক্লান্তি তাকে জড়িয়ে ধরছে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিচ্ছে তার স্নেহময় পিতার সম্বন্ধে বিচিত্র এক চিন্তা—বিচিত্র এক অনুভূতি।

৮

"এ-বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি—"
—সুকান্ত

মহেশবাবু কয়েকদিন অসুস্থ থাকায়, জীবতোষ মাঝে দু'একবার এসে দেখা করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এলেই দেখতে পেতেন হয় স্কুলের কেরানী অনাদিবাবু কিংবা নরেন বাবু, মহেশবাবুর সঙ্গে সতর্ক কণ্ঠে কি যেন একটা আলোচনা করছেন। হঠাৎ তিনি এসে পড়ায় ওদের আলোচনাটা থেমে যেত। জীবতোষবাবু একটু অস্বস্তি বোধ করতেন। ভাবতেন, তাঁর এভাবে এসে পড়াটা বোধ হয় বাঞ্ছনীয় নয়। না এলেই ভালো হত। অথচ মহেশবাবু যে শুধু তাঁর সহকর্মী, তাও নয়। ওঁদের সঙ্গে পারিবারিক হৃদ্যতাও যথেষ্ট। সুতরাং তাঁর অসুখে দেখা করতে না আসাটা খুবই খারাপ দেখায়। শম্পাকে তিনি কয়েকবার বলেছিলেন, মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসতে। কিন্তু শম্পা কথাটা একটু যেন এড়িয়ে গেছে। অবশ্য মহেশবাবুর বাড়ীতে গিয়ে অরূপ কিংবা মহেশবাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে খবরটা এনেছে ঠিকই, কিন্তু মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা করে নি। জীবতোষ বুঝেছিলেন, শম্পা বোধ হয় মহেশবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায় না। এতে জীবতোষ একটু উদ্বিগ্নও হয়েছিলেন। মহেশবাবুর সঙ্গে কোন রকম অপ্রিয় পরিস্থিতি উদ্ভব হবার একমাত্র কারণ হতে পারে, শম্পার স্কুলের চাকরী। সেরকম কিছু কি ঘটেছে? শম্পা অবশ্য এসব কথা নিয়ে কোনদিন বাড়ীতে আলোচনা করে না। জীবতোষবাবুও চান না, বাইরের কর্ম জগতের কোলাহল উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতার যোগসূত্রকে বিপর্যস্ত করুক। জীবতোষ বোঝেন, জীবনে মাঝে মাঝে এ ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বয়স এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে সে ধরনের পরিস্থিতিকে তাঁরা যেমন মানিয়ে নিতে পারবেন, শম্পা কি তা পারবে? হাজার হোক ছেলে মানুষ তো! তাছাড়া জীবতোষের চেয়ে শম্পার সঙ্গেই যেন মহেশবাবুদের প্রীতির সম্পর্কটা বেশী। আর তরুণ বয়সটা এমনই, যখন আত সহজেই

মন উজাড় করে প্রীতির ধারা উৎসারিত হয়ে ওঠে। তাই আঘাতও সব চেয়ে বেশী পায় যৌবন।

জীবতোষ যতটুকু বুঝেছেন তাতে মনে হয়, মহেশবাবু শম্পাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং তার জীবন সংগ্রামের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল। শম্পাও মহেশ-বাবুকে পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির চেয়ে কোন অংশে কম শ্রদ্ধা করে না। এই পর্যন্ত হিসেবটা বেশ সরল। কিন্তু এর পর থেকেই হিসেবটা যেন জটিল হয়ে গেছে।

শম্পার যা মানসিক গঠন তাতে স্কুল-পরিচালনায় কোন ত্রুটি বিচ্যুতি দেখতে পেলে, শম্পা তা এক কথায় মেনে নেবে না। অন্ততঃ বয়সের ধর্মেও ও তার বিরোধিতা করবে। চাকরী পাওয়ার কৃতজ্ঞতা ওকে বশ করতে পারবে না। ওদিকে স্বার্থে আঘাত লাগলে মহেশবাবু ছেড়ে কথা কইবার লোক নন। এই মানসিক ধর্মে দ্বন্দ্ব অনিবার্য। অপ্রিয়তা পরিহার করবার জন্য কতদিন আর নিজের প্রকৃতিকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলা যায়! আর এ সংঘর্ষকে তো খেলোয়াড়ী মনোভাব নিয়ে কেউই গ্রহণ করতে পারবে না। এযে একের ধর্মের সঙ্গে অপরের স্বার্থের সংঘাত!

সেদিন সন্ধ্যের পর জীবতোষ এসে দেখলেন, স্কুলের কেরানী অনাদিবাবু আর নরেনবাবু মহেশের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যাচ্ছেন। জীবতোষকে সম্ভাষণ করে ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। জীবতোষবাবু মহেশের ঘরে এলেন। মহেশ ভালোই আছেন। আগামীকাল স্কুলে যাবেন।

ঘরে ঢুকতেই মহেশবাবু জীবতোষকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, "এই-যে, আসুন। আপনার জন্য একটা সুখবর আছে।"

জীবতোষ নিস্পৃহ কণ্ঠস্বরে চেষ্টা করে একটু আগ্রহের ভাব এনে মৃদু হেসে বললেন, "কী ব্যাপার?"

"একটা টিউশানির অফার এসেছে। আপনি আবার ফস্ করে 'না' বলে বসবেন না।"

"কোথায়?"

"আমাদের নরেনবাবুর ছেলেকে।"

"আমার হয়ে আপনিই তো 'না' বলে দিলে পারতেন।"

"আপনার মতো প্রবীণ লোকের এ-ধরনের দুর্বলতা শোভা পায় না।" একটু গম্ভীরভাবে বললেন মহেশবাবু।

"কিরকম ?" একটু যেন বিরক্ত শোনাল জীবতোষের কণ্ঠস্বর।

"নিজের স্কুলের ছাত্র পড়ালে দুর্বলতাবশতঃ হয়তো পক্ষপাতিত্ব করে ক্লাস-প্রোমোশান পাওয়াতে হবে! হয়তো এই নিয়ে কোন কথা উঠবে, এইসব আর কি। সে-বয়স আমরা কি অনেকদিন আগেই পার হয়ে যাইনি ?"

"আমরা গেছি কিনা, জানি না ঠিক। তবে অভিভাবকেরা যাননি, এটা আমি জানি। তাঁরা ছেলের জন্য প্রাইভেট-টিউটর রাখবার সময়ে, ঠিক ঐ প্রোমোশানের কথা ভেবেই রাখেন।"

"বেশ তো।" কিছুটা নরম হলেন মহেশ, "সে আপনি বলে নেবেন টিউশানি নেবার আগে।"

"একবার বলেছিলাম তাই। অভিভাবক ধরে নিয়েছিলেন ওটা আমাদের প্রোফেশানাল্ বুলি। তাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, সে তো বটেই। আপনি শেখাবার জিনিস শিখিয়ে যাবেন। আপনার ছাত্র নিতে পারে, পাশ করবে, নিতে না পারে, ফেল্ করবে। তাতে আর আপনার দায়িত্ব কি ? তারপর যথারীতি ছাত্র ফেল্ করলে, অভিভাবক বলে পাঠিয়েছিলেন আমি নাকি তাঁকে ঠকিয়েছি।" আবার সেই নিস্পৃহ সুরটা এসে গেল জীবতোষের কণ্ঠে।

"বলল, ভারী বয়ে গেল। সব কথায় কান দেবার দরকার কি ?" তাচ্ছিল্য দেখালেন মহেশ।

"সব কথায় কান না দেওয়াটাই যদি প্রিন্সিপ্‌ল্ হয়, তাহলে তো আপনাদের কথায়ও কান না দিয়ে নিজের বিবেক অনুযায়ী চললে হয়।"

মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই মহেশের। জীবতোষকে আর কিছু বলা যায় না।

"তাহলে তো আর কিছু বলার নেই। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম, শম্পার মতো একটি ছেলেমানুষ মেয়ে চাকরি করবে, আর আপনি বসে বসে দেখবেন, সেটা হয়তো আপনার ভালো ঠেকবে না। তাই চেষ্টা করছিলাম।"

"অনর্থক খোঁচা দিয়ে লাভ নেই, মহেশবাবু। কে কোন্ বয়সে রোজগার করবে, সেটা তার পরিবারের আর্থিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। চাষীর ঘরে আট-দশ বছর বয়স হতে-না-হতে ছেলে বাপের সঙ্গে বেরোয়। শম্পা এখনই বেরোচ্ছে। অরূপের এখনও দরকার হয়নি। সুতরাং ও-প্রসঙ্গ ছেড়ে দিন। ভালো কথা—হেড-মাস্টারমশাই কি ছুটি নেবেন ? আপনি তো অনেক খবর রাখেন।"

মহেশ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, "হ্যাঁ, নেবেন।"

"তাই তো। তাহলে তো ছেলেদের বড্ড অসুবিধে হবে।"

মহেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতে জীবতোষ বললেন, "মানে, উনি সপ্তায় দুটো করে ইংরিজির ক্লাস নিতেন। সেগুলো আর কেই বা নেবেন!"

"ও, এই ব্যাপার!" তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বললেন মহেশ, "আর এদিকে যে উনি স্কুলটাকে উঠিয়ে ছাড়ছেন, সে-খবরটা রাখেন?"

"কেন?"

"ক্যাশ থেকে কত সরলো, তা জানেন? এবারে অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় প্রুফ দেখতে দিয়েছিলেন পেয়ারের মাস্টার-মশাইদের। তাতে ফল কী হয়েছে জানেন? বিল্ডিং কন্‌সট্রাক্‌শানে—"

"আপনার মশাই যত বাজে খবর রাখার অভ্যেস। এত সময় পান কোথায় বলুন তো?"

"বাজে কথা!" চাপা রাগে মহেশবাবু বললেন, "সামনের কমিটি মীটিং-এ দেখতেই পাবেন, কী হয়।"

জীবতোষবাবু উঠে পড়েছিলেন যাবার জন্যে। হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হেড-মাস্টারমশাই-এর বিরুদ্ধে কি কোন স্টেপ নেওয়া হবে?"

"দেখবেন, কথাটা যেন ফাঁস না হয়ে যায়।" মহেশের চোখ-মুখে সতর্কতা ফুটে উঠল।

"না, না, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।" জীবতোষও মহেশের মতো সতর্ক কণ্ঠে বললেন, "তাহলে কি আপনার হেড-মাস্টার হওয়ার একটা চান্‌স্- "

হঠাৎ যেন বিগলিত হয়ে পড়লেন মহেশবাবু, "দেখুন, আপনাকে ঐ কথাটাই বলব বলে, দেখা করতে বলেছিলাম। ঠিক বলতে পারছিলাম না। কি জানি, আপনি আবার কী ভাববেন। কমিটির মেম্বাররা আপনার কথার খুব দাম দেন। আপনি যদি আমার হয়ে একটু—মানে—ওঁদের কাছে বলেন—মানে—"

"পড়ানোর থেকে স্কুল চালানোয় আপনার বেশী ঝোঁক। সুতরাং হেড-মাস্টারির পক্ষে আপনি উপযুক্ত। আমি কিন্তু পড়ানোর অভ্যাসটা এখনও ছাড়তে পারিনি। তাই ক্যান্‌ভাসিং আমার দ্বারা হয় না। সুতরাং মাপ করবেন। আচ্ছা, আজ তাহলে চলি—"

জীবতোষবাবু বেরিয়ে যেতে মহেশবাবু হঠাৎ রাগ করতে গিয়ে নিজেকে সংযত করলেন শরীরের কথা ভেবে। তারপর যেন কতকটা অসহায়ের মতো মনে মনে বললেন, আচ্ছা, রিটায়ারমেন্ট্ তো এসে গেল। এক্স্টেন্শানের জন্য আমার কাছেই আসতে হবে।

মহেশবাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে জীবতোষবাবু চিন্তিত হলেন শম্পার জন্য। জীবতোষকে দিয়ে মহেশবাবুর স্বার্থোদ্ধার হল না। সুতরাং শম্পার ওপর যে এর প্রতিক্রিয়া হতে পারে, সে সম্ভাবনার সূচনা হয়ে রইল। শম্পাকে জীবতোষ বিশেষ কিছুই সাহায্য করতে পারেন নি। চাকরীটা অবধি শম্পা নিজেই যোগাড় করে নিয়েছে। অথচ তাঁরই জন্য শম্পাকে হয়তো ঝামেলায় পড়তে হবে।

নিজের ওপর বিরক্ত হলেন জীবতোষ। কিছুটা ক্ষুব্ধও। শেষ অবধি যেন নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই ভাবলেন, শিবতোষ গাঙ্গুলির মেয়ে শম্পা। মহেশবাবুকে তোয়াজ করে তার চাকরী বজায় রাখবার চেষ্টা করলে, শম্পাই তাঁকে ক্ষমা করতে পারবে না।

প্রমীলা অরূপকে বললেন, "বিলেত যাবার আগে তোকে বিয়ে করে যেতে হবে। তোর বাবার বন্ধু ডক্টর সমাজপতি সম্বন্ধ এনেছেন। মেয়েটি খুব ভালো। বি.এ. পাস করেছে।"

অরূপ খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘাড় নেড়ে বলল, "আচ্ছা।"

"আচ্ছা কি রে!" উদ্বিগ্ন প্রমীলা প্রশ্ন করলেন, "কবে মেয়ে দেখতে যাবি বল্?"

"তুমি দেখে এলেই চলবে।"

মনে মনে খুশী হয়ে প্রমীলা বললেন, "না বাপু, তুই নিজে একবার দেখে আয়। ওরা বড্ড তাড়া দিচ্ছে।"

"ব্যস্ত হবার কি আছে। তুমি তো বললে, বিলেত যাবার আগে বিয়ে করলেই চলবে। আমি তো এখন বিলেত যাচ্ছি না।"

"ওমা, সেকি রে! পাসপোর্ট করতে দিয়ে দিলি, আর এখন বলছিস—"

"বিলেত যেতে আমার এখন তত ভালো লাগছে না।"

"ওমা, বিলেত যাওয়াটা ভালো-লাগালাগির ব্যাপার নাকি? নে বাপু, আর রাগাসনি আমাকে!"

"সত্যি বলছি মা, বিলেত যাবার আগে বিয়ে করতে হবে শুনে, আমার আর একটুও যাবার ইচ্ছে নেই।" যেন কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল অরূপ।

"কেন শুনি?" ছেলের রকম দেখে সত্যিই রেগে গেলেন প্রমীলা।

"বা রে, বকছ কেন! আমি ভেবেছিলাম বিলেত গিয়ে একটা মেমসাহেব বিয়ে করে আনবো।"

"দেখ্, খোকা, আর হাড় জ্বালাসনি বলছি! তোর কী হয়েছে বল্ তো? ক'দিন ধরেই দেখছি, বিলেত যাওয়ার কথা উঠলেই তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস। কেন, তোর কি সত্যি-সত্যিই যাবার ইচ্ছে নেই?"

হাল্কা উত্তর দিয়ে দিয়ে মাকে এড়িয়ে যাচ্ছিল অরূপ এ ক'দিন। তাই চট্ করে উত্তর দিতে পারল না। মনের গোপন ইচ্ছেটা হঠাৎ এরকম ভাবে প্রমীলার কাছে ধরা পড়ে যাবে, তা সে মোটেই ভাবেনি।

প্রমীলা অবশ্য কথাটা কথার পিঠেই বলে ফেলেছিলেন। অরূপকে চুপ করে থাকতে দেখে সন্দিগ্ধ হলেন। সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, "হ্যাঁ রে, তুই তো কোনদিন কোন কথা আমার কাছে লুকোস না। তবে আমার কাছে বলছিস না কেন, কী হয়েছে?"

"না, মা, কই কিছু তো হয়নি।" বলেই অরূপ উঠে পড়ল, "আমি একটু দেবেশের কাছ থেকে ঘুরে আসছি।"

"দাঁড়াও।" প্রমীলার তীব্র কঠিন কণ্ঠস্বরে অরূপ চমকে উঠল। মায়ের এরকম কণ্ঠস্বর সে জীবনে শোনেনি। যেন মন্ত্র-মুগ্ধের মতো সে ঘুরে দাঁড়াল।

"তুমি আমাকে স্পষ্ট বলে যাও, তোমার বিলেত না যাওয়ার কারণ কী। তোমাকে এত পয়সা খরচ করে মানুষ করা হয়েছে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য। মাঝপথে তুমি আমাদের সে-পরিশ্রম নষ্ট করে দিচ্ছ কেন?"

মুখ গোঁজ করে অরূপ উত্তর দিল, "চাকরি করে টাকা জমিয়ে বিলেত যাব, তাই কিছুদিন দেরি হবে।"

হঠাৎ কথাটা বলে ফেলতে পেরে অরূপ যেন আবার ওর সহজ ভাবটা ফিরে পেল।

বিস্মিত প্রমীলা প্রশ্ন করলেন, "তার মানে? তোমার বাবা তাহলে এত

বয়স অবধি খাটছেন কার জন্য? এই বয়সে আবার ওঁকে হেড-মাস্টার করছে সবাই মিলে। এই যে এত খাটুনি, সে কার জন্য?"

"সে তুমি বাবাকেই জিগেস কোরো। মিথ্যে বদনাম দিয়ে, জাল-জোচ্চুরি করে হেড-মাস্টারকে সরিয়ে, নিজে হেড-মাস্টার হবার জন্য বাবা চেষ্টা করছেন কেন জানি না। পাছে আমার বিলেত যাওয়ার জন্য হয়, এই ভয়ে যাচ্ছি না।"

"মিথ্যে বদনাম দিয়ে! জাল-জোচ্চুরি করে! তুই কী বলছিস খোকা?"

"ঠিকই বলছি। অনাদি-ই আমাকে সব বোঝাচ্ছিল। হেড-মাস্টারমশাই একটু অভাবী লোক। স্কুল-ফাণ্ড থেকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা নিতেন। আবার সুবিধে মতো শোধ করে দিতেন। অনাদি ছাড়া এ আর কেউ জানত না। বাবা অনাদিকে এই সুযোগে প্রচুর টাকা সরাতে পরামর্শ দিয়েছেন। দায়িত্ব হেড-মাস্টারের আর অনাদির। দুজনেরই চাকরি যাবে। অনাদি ঐ টাকাটা নিয়ে বাবার সাহায্যে বই-এর ব্যবসা করবে। এ অবধি সব ঠিকঠাক। আগামী কমিটি-মীটিং-এ বোধহয় সব পাস হবে। জীবতোষবাবুকে বাবা দলে টানবার চেষ্টা করেছিলেন। উনি রাজী হননি। ফলে শম্পার চাকরি যাবার ঠিকঠাক হয়েই আছে। জীবতোষবাবু বোধহয় আর এক্স্‌টেন্‌শান্‌ পাবেন না।"

প্রমীলার অসহায় মুখের ওপর হাল্‌কাভাবে কথাটা ছুঁড়ে দেয় অরূপ।

"এরকম ভাবে মানুষ করবার চেষ্টা না করলেও, আমি বোধহয় অমানুষ হতাম না।"

অরূপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর নির্বাক প্রমীলা অরূপের চলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ আন্দোলিত পর্দাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটু একটু করে গ্লানি জমছিল অরূপের মনে।

সচ্ছল পরিবারে মানুষ, বাপ-মায়ের আদরে, লেখা-পড়া শিখে, পাশ করে ডাক্তার হয়েছে। জীবন ওর কাছে কোন দিনই কোন সমস্যা নিয়ে উপস্থিত হয়নি। তাই জীবন সম্বন্ধে ও কোন দিনই খুব একটা সীরিয়াস ছিল না। হৈ-চৈ করে, গান গেয়ে, আড্ডা দিয়ে জীবনটা ওর চলছিল মন্দ নয়।

প্রথম ওকে জীবন নিয়ে চিন্তা করতে শেখালে শম্পা; তারপর মহেশ।

ও প্রথম থেকেই জানত দেবেশ শম্পার অনুরাগী, তাই অমরেশের সঙ্গে শম্পার বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে শুনে ও খুবই আঘাত পেয়েছিল। প্রথমতঃ

দেবেশের জন্য, দ্বিতীয়তঃ অমরেশকে ও একদম পছন্দ করত না। শম্পার ওপরও তাই কিছুটা বিরক্ত হয়েছিল।

কিন্তু শম্পাকে পড়তে পড়তেই চাকরী নিতে দেখে অরূপ বিস্মিত হয়েছিল। কাছ থেকে বুঝতে চেয়েছিল, ওর অভাবের তীব্রতাটা কত! তারপর একটু একটু করে সহানুভূতির সঞ্চার হয়েছিল শম্পার প্রতি।

মহেশবাবুর ব্যাপারটা অরূপকে ক্লিষ্ট করেছিল। জীবন-যন্ত্রনার স্বরূপ প্রথম উদ্‌ঘাটিত করেছিল তার মনে। বাপ-মার স্থান ছিল তার কাছে শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় মণ্ডিত। অথচ তরুণ জীবনের শুচি-শুদ্ধ অন্তঃকরণ অন্যায়-বোধকে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে পারছিল না। মানসিক উত্তেজনায় তর্ক করতে গেল বাবার সঙ্গে। কিন্তু যখন দেখল, মহেশবাবু স্বকৃত কর্ম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন, তখন থেকেই তার মনে একটু একটু করে গ্লানি জমছে। এর ওপর যখন বুঝল, এই স্বার্থের সংঘাত নেমে আসছে শম্পার ওপর, তখন ও কেমন যেন অসহায় বোধ করল। ওর ইচ্ছে হল, ছুটে গিয়ে শম্পার পাশে দাঁড়ায়। শম্পাকে বুঝিয়ে বলে, নিজেকে একটু যেন বাঁচিয়ে চলে। অথচ শম্পাকে ও যতটুকু চিনেছে, তাতে তার কথায় শম্পা কর্ণপাতও করবে বলে মনে হয় না। কিন্তু অরূপ বুঝেছে, মহেশদের সঙ্গে সংঘর্ষে শম্পা গুঁড়িয়ে যাবে। ওদের কাছ থেকে যে আঘাত শম্পা পাবে, তা কি অরূপ শম্পার হয়ে গ্রহণ করতে পারে না?

অকরুণ জীবন-রাগিনীতে অনুরণিত হয়ে উঠছে শম্পার চলার পথ। তাই আপাততঃ স্বকৃত অসাচ্ছল্যে ছন্দপতন ঘটুক অরূপের পথ চলায়।

৯

"প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল"

—সুকান্ত

"একি কাকীমা, আপনার কি হয়েছে? চেহারা এরকম শুকনো-শুকনো কেন?"

শম্পার উদ্বিগ্ন প্রশ্নে অনেকদিন পর প্রমীলা একটু স্বস্তির হাসি হাসলেন। মনের মধ্যে নিরন্তর চিন্তার যে বিশৃঙ্খল এলোমেলো ধারাটা বইছে, তার ছাপ দেহের ওপর স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এটা তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু অরূপ বা

মহেশ, কেউই এটা তেমন লক্ষ্য করেননি। অন্যসময়ে এরকমটি হতে পারত না। তাই ক্ষীণ একটা অভিমানের সূত্রে প্রমীলা বুঝতে পারছিলেন, ওরা দুজনেই এখন নিজের নিজের চিন্তায় ভীষণ ব্যস্ত। আর উনি উদ্বিগ্ন ওদের দুজনের চিন্তায়। তাই হঠাৎ শম্পার আগমনে এবং তার প্রশ্নে, ওঁর মনের দুশ্চিন্তাটা যেন কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা পড়ে গেল।

কিন্তু প্রমীলা তো শুধু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত নন। দীর্ঘ সংসার জীবনে অনেক দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়েই তাঁকে পাড়ি জমাতে হয়েছে। সুতরাং শুধু মাত্র দুশ্চিন্তায় তিনি এমন ভেঙে পড়তেন না। আসলে মনের মধ্যে তিনি কিছু-দিন ধরে বহন করে চলেছেন একটা ক্লিষ্টতা। আর সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেও পারছেন, এ ক্লিষ্টতা বোধ হয় বাকী জীবন তাঁকে বহন করে নিয়ে যেতে হবে। তাই আজ তিনি ভেঙে পড়েছেন, সংসার তরণীর হাল ছেড়ে দিয়ে।

সতেরো বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়। কৈশোর স্বপ্নে যে আকাশ তাঁর ছেয়ে থাকত, সে আকাশে প্রথম নায়ক তরুণ মহেশ। স্বামীর পায়ে নিজেকে উজাড় করে আত্ম-নিবেদনের যে সহজ সরল ভালোবাসার রূপটি প্রমীলার মনের পটে আঁকা ছিল, সে রূপটি ফুটিয়ে তুলতে তাঁর বিন্দু মাত্র অসুবিধে হয়নি। তারপর তিরিশটি বছর কেটে গেছে—অনেক সুখ দুঃখ, হাসি-কান্না, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে। স্বামীকে তিনি শুধু ভালোই বাসেন না। নিজের মনোজগতে স্বামী শ্রদ্ধার এক অন্তর-লোকে প্রতিষ্ঠিত। বাইরের কর্ম জগতের ন্যায় নীতি নিয়ে কোনদিন স্বামীর সঙ্গে তাঁর মত-বিরোধ হয়নি। বা বলা যায়, সে সুযোগ তাঁর আসেনি। আজ হঠাৎ স্বামীর সেই শ্রদ্ধার আসন ভেঙে চুরমার করে দিল অরূপ।

মহেশ তাঁর কর্ম জগতে যা করছেন, তার চুলচেরা নৈতিক বিশ্লেষণ প্রমীলা করেন,নি। করতে চানও না। ইচ্ছে করলেই তিনি মহেশকে এ বিষয়ে জিগেস করতে পারেন। মহেশের কোন কাজ তাঁর মনোমত না হলে, মহেশকে অনুরোধও করতে পারেন, সে কার্যক্রম ত্যাগ করবার জন্য। কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। ছেলের মনে বাপের প্রতি শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। হাজার চেষ্টা করলেও সে ক্ষতি কি কোনদিন পূরণ হবে? তাঁর স্বামীর ওপর অন্ততঃ একটি লোকের সমস্ত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। এ তিনি কি করে সহ্য করবেন? একদিকে বাপের বিরুদ্ধে ছেলের শ্রদ্ধাহীন অভিযোগ, আর একদিকে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কুণ্ঠাহীন ভালোবাসা, এই

দোটানায় পড়ে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলেন নারীর চিরন্তনী প্রতিমা, প্রমীলা।

"হ্যাঁ রে, কাকীমা মরল কী বাঁচল, একবার খবরটুকুও নিতে নেই? কতদিন পর এলি বল্ তো।"

প্রমীলার মনের অভিমানের সুরটুকু সহজ-সরল মনের কথা বলবার সঙ্গী পেয়ে যেন অনায়াসেই বেরিয়ে এলো। শম্পা রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। কিছুদিন ধরে এ বাড়িতে আসতে সে একটু সঙ্কোচ বোধ করছিল। হেড-মিস্ট্রেসের সঙ্গে তার ছোটখাটো সংঘর্ষগুলি যথা-নিয়মে মহেশবাবুর কর্ণগোচর করা হয়েছে, সে-খবর শম্পা পেয়েছিল। মহেশবাবু যদি হেড-মিস্ট্রেস্‌কে ব'লে দিতেন, উনি সোজাসুজি কমিটিতেই শম্পার নামে অভিযোগ করুন, মহেশবাবু শম্পার পক্ষেও থাকবেন না, তাহলে শম্পা স্বস্তি বোধ করত। কিন্তু শম্পা জানত না, মহেশবাবুর পক্ষে হেড-মিস্ট্রেস্‌কে তা বলা সম্ভব নয়।

এইসব পাঁচ-সাত ভেবে শম্পা এ ক'দিন আসতে পারেনি। এ বাড়ীর আবহাওয়া যে এর মধ্যেই বেশ কিছুটা বদলে গেছে, তা সে জানতনা। তাই সদাহাসিখুশী প্রমীলার কথা শুনে, ও অবাক হয়ে প্রমীলার দিকে তাকালো। অভিমান ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'বারে বা! এত শরীর খারাপ হয়েছে, একটু খবরও দিতে নেই! আমি না হয় ক'দিন টেস্ট্-পরীক্ষার জন্য একটু ব্যস্ত ছিলাম।"

"ওমা, মেয়ের কথা শোন! কোথায় শরীর খারাপ রে!"

"আমি কোন কথা শুনবনা।" ব'লে এগিয়ে এসে প্রমীলাকে জড়িয়ে ধরে ব'লে উঠল, "একি, গা যে গরম! চলুন, শুয়ে পড়বেন।" ব'লে একরকম টানতে টানতেই প্রমীলাকে নিয়ে চলল। "আচ্ছা কাকীমা, ছেলে কি আপনার একটু খোঁজ খবর রাখেনা? বাবু কি ডাক্তার হয়েছেন, মাকে বিনা-চিকিৎসায় ফেলে রাখবার জন্য?"

হঠাৎ যেন প্রমীলার চোখ-দুটো ঝাপসা হয়ে এলো। প্রবীণা গৃহিণীর স্থৈর্য এবং ধৈর্যের আড়ালে চোখের জলের যে মেঘটাকে তিনি আড়াল দিয়ে রেখেছিলেন, শম্পা যেন ফুঁ দিয়ে সে-আড়ালটাকে অবলুপ্ত করে দিল। প্রমীলার ছল্‌ছল্ চোখের দিকে তাকিয়ে সংসার-অনভিজ্ঞা শম্পার মোটেও মনে হলনা, এটা তাঁর জ্বর আসবার লক্ষণ। প্রমীলার মনের মধ্যে কোথাও একটা বেদনার সুরের আলাপ চলছে, এটা শম্পার তরুণ মনে সহজেই মুদ্রিত হয়ে গেল।

প্রমীলাকে খাটে শুইয়ে দিয়ে, শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে

দিতে দিতে শম্পা অনেক কিছু আবোল-তাবোল বকে গেল। স্কুলের গল্প, হাবলু-কাবলুর গল্প, বাড়ীর গল্প—এইসব। তারপর একসময়ে লক্ষ্য করল, প্রমীলা চোখ বুজে শুয়ে রয়েছেন। দেখে ও বলল, "কাকীমা, আপনি আজ বিশ্রাম করুন। আমি চলি।"

শম্পার হাত-দুটো নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে প্রমীলা বললেন, "আবার আসবি তো?"

"কেন আসবনা? নিশ্চয় আসব।" হাসিমুখে প্রমীলার মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল শম্পা।

"তাহলে তোকে একটা কথা জিগেস করি। রাগ করবিনা তো?"

"কী যে বলেন কাকীমা!" শম্পা একটু কৌতূহলী হল।

"ধর্, অরূপের সঙ্গে তোর ঝগড়া হয়ে গেল, তাহলেও কাকীমাকে দেখতে আসবি?"

"ইস্, অরূপের সঙ্গে ঝগড়া হল তো, ভারী বয়ে গেল। তার জন্যে আপনাকে দেখতে আসব না কেন?"

"আর ধর্—অরূপের বাবার সঙ্গেই যদি হয়—?" ধরা-ধরা গলায় জিগেস করলেন প্রমীলা।

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেল শম্পা। তাহলে কি প্রমীলা কিছু শুনেছেন? ছি, ছি, একি অশান্তি! একটা নিরুপায় ক্ষোভে আর অস্বস্তিতে ওর মনটা তিক্ত হয়ে উঠল। এই মুহূর্তে প্রমীলাকে ও কী বলবে!

"তুই একটুও ভয় পাস নি। যা ভালো বুঝিস, তাই করবি। তোর ওপর আমার বিশ্বাস আছে।"

ফিস্‌ফিস্ করে বললেন প্রমীলা।

এমন সময়ে হঠাৎ ঘরে ঢুকল অরূপ।

"একি! কী ব্যাপার? কি হয়েছে মা?"

"বিশেষ কিছু না।" শম্পা গাম্ভীর্যের ভান করে বলল, "শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।"

"সেকি!" অরূপ ঠিক যেন বুঝতে না পেরে বলল, "আমাকে তো কিছু বল নি।"

"না রে, আমার কিছু হয় নি। মেয়েটা জোর করে আমায় এনে শুইয়ে দিলে।" প্রমীলা বললেন।

"না, না, শুয়ে থাকো। আমি একটু দেখছি।"

অরূপ এগিয়ে এল।

শম্পা প্রমীলাকে আড়াল করে গম্ভীরভাবে বলল, "না, থাক্। এতদিন যখন চোখে পড়ে নি, তখন উপস্থিত না দেখলেও চলবে।"

অরূপ এতক্ষণে বুঝতে পেরে হেসে বলল, "আরে, আমার মাকে দেখতে দেবে না?"

"আমার কাকীমাকে হাতুড়ে-ডাক্তার দেখাব না।"

"না রে বাপু, না. কিছুই হয় নি। মেয়েটা শুধু শুধু এমন করছে—কী দেখবি দেখ্।" প্রমীলা বললেন।

"ঐই দেখ! ছেলেকে যেই হাতুড়ে-ডাক্তার বলেছি, অমনি কাকীমার লেগেছে। তাড়াতাড়ি অমনি ছেলেকে দেখাবার দরকার পড়ে গেল। নাও বাপু, দেখ তোমার মাকে।"

অরূপ, শম্পা দুজনেই হেসে উঠল। আর প্রমীলাও বুঝি লজ্জিত হাসি হাসলেন।

প্রমীলাকে পরীক্ষা করে, ওঁকে বিশ্রাম নিতে বলে ওরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের দিকে চেয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুলেন প্রমীলা। কী সুন্দর মেয়ে! কথা বলে বুকটা যেন হাল্‌কা হয়ে গেল। কোন পাড়াগাঁয়ের গেঁয়ো বাপ-মার মেয়ে। সামাজিক মর্যাদা তেমন হয়তো কিছুই নেই। ওখানে ছেলের বিয়ে দিলে নিজেদের মান মর্যাদা কিছুই বাড়বে না। আত্মীয়-স্বজনের ঈর্ষিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ঘর-ভরা জিনিস তুলতে পারবেন না। উনি বোধহয় রাজী-ই হবেন না। এক কথায় সব কিছুই নাকচ করে দেবেন। অথচ এমন মেয়ে চোখেই পড়ে না। আর, দুটি মনের মিলও আছে।

অরূপের ঘরের সামনে এসে শম্পা বলল, "আজ চলি।"

"এসো না। একটু বসবে।"

অনুরোধ করল অরূপ।

দুজনে ঘরে এসে বসল। অনেকদিন পর আজ দুজনে একত্র হয়েছে এর ভেতরে ওদের চেতনাশক্তিতে অনেক নতুন অনুভূতি দেখা দিয়েছে। যে ওরা বলবে, তা নিজেরা ভেবেই পাচ্ছে না।

অরূপ যেদিন থেকে শম্পার কথা বিশেষ করে ভাবছে, সেদিন থেকেই যেন

একটা সহানুভূতির যোগসূত্রে ও একেবারে ওর কাছাকাছি চলে গেছে। সংঘাত বিক্ষুব্ধ শম্পার জীবনে ও যেন নিজেকে মনে করেছে, ওর পাশটিতে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে আবার লজ্জাও পেয়েছে এরকমভাবে ভাববার জন্য।

আজ কিন্তু শম্পার মুখোমুখি বসে সে নৈকট্য অনুভব করতে পারল না অরূপ। দেবেশের ঘরে বসে যে মেয়েটির সঙ্গে কতদিন গল্প-আড্ডা-গানে সময় কাটিয়েছে, অমরেশের প্রসঙ্গে যাকে কত ঠাট্টা-তামাসা করেছে, সেই মেয়েটিই যেন জীবন-বোধের কি এক নতুন প্রতীতির ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। হাজার চেষ্টা করেও অরূপ যেন ওর নাগাল পাচ্ছে না, তাই বলবার কথা তার অনেক থাকলেও কি প্রসঙ্গ দিয়ে যে কথাবার্তা সুরু করা যায়, হাতড়াতে লাগল মনের সঙ্গোপনে।

"পরীক্ষা কেমন দিলে ?" অরূপ বলল।

"হল একরকম। কাকীমাকে একবার ভালো করে পরীক্ষা কোরো।"

"হ্যাঁ, করব।"

"দেবেশের খবর কি ? তোমাদের ফাংশান্‌টা শুনলুম যাচ্ছে তাই হয়েছে ?"

"তা বলতে পার।"

আবার দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"অমরেশবাবু ভালো আছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"শম্পা, তুমি স্কুলের সব ব্যাপারেই মাথা গলাও কেন ?"

"তাতে তোমার কি ক্ষতি হয়েছে ?"

হাল্‌কা ভাবে বলল শম্পা।

"তোমার ক্ষতির কথা ভেবেই বলছি।" আহত স্বরে অরূপ বলল, "কোন্ টীচারকে ফার্স্ট পিরিয়ডে ক্লাস দিলে তাঁর অত ভোরে আসতে অসুবিধে হয়, স্কুলের ডিসিপ্লিন্ বজায় রাখবার জন্য হেড-মিসট্রেস কাকে কী বলেছেন, তার প্রতিবাদ জানানো—এসব ব্যাপারে যদি মাথা ঘামাও, তাহলে চাকরির কন্‌ফার্‌মেশান্ হবে কি করে !"

"কমিটির হোম্‌রা-চোম্‌রারা যদি, স্কুলে পড়াশোনা হচ্ছে কিনা, তা না দেখে, এইসব তুচ্ছ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দেন, তাহলে সত্যিই আমার কন্‌ফার্‌মেশান্ হবে না।"

অরূপের দুর্বলতায় ঘা লাগল। এতদিন শম্পার এই যুক্তিগুলো দিয়েই

ও নিজের মনের মধ্যে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করছিল। একটু তিক্ত কণ্ঠে তাই ও বলল, "হোম্‌রা-চোম্‌রারা হয়তো অনেক তুচ্ছ বিষয়েই মাথা ঘামান। কিন্তু স্কুলের বাড়ী তৈরি হচ্ছে কিনা, সিঁড়িটা শেষ হল কিনা, এসবগুলো বোধহয় তাঁদেরই দেখবার কথা। স্কুলের টীচারদের নয়।

"ঠিক কথা। কিন্তু একে ভাঙা সিঁড়ি, তার ওপর রেলিং লাগানো নেই, তাতে যদি ছাত্রী কিংবা টীচারদের প্রাণ-সংশয় থাকে, তাহলে তারা নিশ্চয়ই দেখবে। কেননা এটা তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপার। তা সে হেড-মিস্‌ট্রেস্‌ এবং সেক্রেটারি যতই ওটা চাপা দেবার চেষ্টা করুক।"

শম্পা কঠিন স্বরে কথাগুলো বলল। অরূপের মুখটা কালো হয়ে গেল। অরূপের সামনে মহেশকে সেক্রেটারি ব'লে সম্বোধন করা শম্পার এই প্রথম।

"কিন্তু তুমি তো বাবাকে সেক্রেটারি হিসেবেই বলতে পারতে।"

"তাই বা কেন বলব? টীচাররা সবাই মিলে সেক্রেটারির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সিঁড়িটা তাড়াতাড়ি মেরামত করে দেবার জন্যে। যেটা তাঁর নিজেরই করা উচিত ছিল। এর ভেতর উনি দলাদলি, রাজনীতি, নোংরামি—অনেক কিছুরই নাকি গন্ধ পেয়েছেন। আমি নিজে এসে বলব, মানে কি তাঁর অনুগ্রহ চাইব? এটা কি অনুগ্রহ চাওয়ার ব্যাপার?"

অরূপ কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রইল।

শম্পা ভাবল, মহেশবাবু সম্পর্কে কথাগুলো অরূপের সামনে এরকম ভাবে না বললেই হ'ত।

কিছুক্ষণ পর অরূপ মুখ তুলে বলল, "যার বিরুদ্ধে তোমার এত অভিযোগ, তিনিই তোমাকে চাকরিটা দিয়েছেন এবং তাঁর ইচ্ছেতেই তোমার চাকরিটা চলে যেতে পারে।"

শম্পার চোখ-দুটো যেন জ্বলে উঠল।

"ভয় দেখিওনা, অরূপ। আমার ঊর্ধ্বতন দু'পুরুষকে ব্রিটিশ পুলিশ ভয় দেখিয়ে কাবু করতে পারেনি। স্কুলের একজন সেক্রেটারি আমাকে শায়েস্তা করতে পারবে না। তোমার বাবা চাকরি দেবার সময়ে আমাকে তাঁর দলের পেটোয়া থাকতে হবে, এমন কোন সর্ত দেননি। তাহলে চাকরি আমি কিছুতেই নিতাম না।"

"শম্পা—" আহতকণ্ঠে কী যেন বলতে গিয়ে অরূপ চুপ করে গেল।

এতটা উত্তেজনা প্রকাশ করে ফেলে শম্পার খুব বিশ্রী মনে হতে লাগল। দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর নীরবতা ভেঙে অস্ফুটকণ্ঠে শম্পা বলল, "কিছু মনে কোরো না। আজ চলি।"

অরূপ মুখ তুলে বলল, "এসো।"

শম্পা চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই অরূপ বলল, "এক মিনিট!"

শম্পা না ফিরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। অরূপ পেছন থেকে ক্লিষ্ট স্বরে বলল, "আমার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাকে সাবধান করে দেওয়া, হঠাৎ যাতে তোমার চাকরিটা না যায়। ভুল করে তোমাকে আঘাত দিয়ে ফেললাম। ক্ষমা কোরো।"

শম্পা ফিরে অরূপের দিকে তাকালো। অরূপ ওর দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে মুখ নামিয়ে নিল। শান্ত পদবিক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো শম্পা।

১০

"বৃদ্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা"
—সমর সেন

হেড-মিস্ট্রেস্ মালতীমালা রায় অনেকক্ষণ ধরে মহেশবাবুকে গার্ল্‌স্ স্কুলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা বোঝাচ্ছিলেন। মহেশবাবু মনোযোগ দিয়ে শোনবার ভান করে নিজেদের স্কুলের আগামী কমিটি-মীটিং-এর কথা চিন্তা করছিলেন।

সামনের মীটিং-এ উনি স্কুল ফাণ্ডের একটা হিসেব পেশ করে দেখাবেন যে, স্কুলের টাকা কেউ কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ সহজ ভাষায় যার অর্থ হল তছরুপ করা। হিসেবটা কমিটির সদস্যদের কাছে বেশ বিশ্বাস যোগ্য হওয়া চাই। বিশেষ করে ডক্টর মল্লিক আর ডক্টর পাল—এঁদের দুজনের কাছে। এঁরা কমিটির বিশেষ প্রভাবশালী সদস্য আর নিরপেক্ষও বটে। কোন দলাদলির ভেতর যান না। মালতীর সঙ্গে ওঁদের যথেষ্ট পরিচয় থাকায়, মহেশ মালতীকে দিয়ে ব্যাপারটা ওঁদের কর্ণগোচর করে, ওঁদের মতামতটা জানতে চাইছিলেন। ব্যাপারটায় যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। বিশেষ করে হেডমাস্টার মশাইয়ের চাকরীটা যাবার সম্ভাবনা তো রয়েছেই। মহেশ ভেবেও

ছিলেন যথেষ্ট, একটা লোকের চাকরী যেখানে জড়িত। কিন্তু স্কুল ফাণ্ডের টাকা নিয়ে যথেচ্ছ ব্যবহার করাটা তাঁর কাছে মোটেই উচিৎ বলে মনে হয় না। এ ক্ষেত্রে হেড মাস্টারমশাইর সরে যাওয়াই শোভন। তা যখন হচ্ছে না, তখন তাঁকে সরাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। হাতের কাছে একটা সুযোগ থাকায় মহেশ সেইটার সদ্ব্যবহার করছেন মাত্র। সুযোগটা কাজে লাগাতে মালতীর সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে মহেশের পক্ষে বর্তমানে মালতীর সব কথায় সায় না দিয়ে উপায় নেই।

মালতী শম্পাকে মোটেই ভালো চোখে দেখছে না। স্কুল পরিচালনায় নানা ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে শম্পা সব সময়েই অভিযোগ করে। শুধু যে হেড-মিসট্রেসের কাছে করে তাই নয়। মাঝে মাঝে সেক্রেটারী বা কমিটি মেম্বারদের কাছেও জানিয়ে আসে। শম্পার এ ধরনের কাজকে মালতী একদম পছন্দ করে না। তার ইচ্ছে, শম্পার চাকরীর কন্‌ফারমেশান যেন না হয়। নেহাত মহেশ বাবুর জন্যে কিছু করে উঠতে পারছে না।

মহেশ সেটা বোঝেন। কিন্তু নিজের স্কুলের ব্যাপার নিয়ে তিনি এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে মালতী যদি শম্পার ব্যাপারে একটা চরম কিছু করে বসে, তাহলে মালতীকে বাধা দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মহেশ মালতীর শব্দ স্রোতে বাধা দিলেন।

"হ্যাঁ, ভালো কথা, মালতী। সিঁড়িটার তুমি কী করলে?"

"আপনারা স্যার ওটার জন্যে অনর্থক চিন্তা করছেন। ওটা তেমন একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক হয়ে নেই। শম্পাই দল পাকিয়ে মেম্বারদের কাছে দরখাস্ত দিয়ে, ওটাকে একটা গুরুতর ব্যাপারে দাঁড করিয়েছে।

"তা হোক। কমিটি যখন হাজার দুয়েক টাকা ওটার জন্য স্যাংশান্ করেছে, তখন ওটা সেবে ফেল। চেক্ পেয়ে গেছ তো?"

"হ্যাঁ, স্যার। সে তো পেয়েছিই। সে আপনি যখন আছেন, তখন ওসব ব্যাপার আমি ভাবিই না। অ্যানুয়াল পরীক্ষার ব্যাপারে একটু ব্যস্ত ছিলাম। তার ওপর ধরুন না, আমার বাড়ীটাও তো শুরু করে দিয়েছি, এইসব পাঁচ-সাত কারণে ওটা আর ধরা হয়নি। তা ওটা নিয়ে আপনি বিন্দুমাত্র ভাববেন না। আমি আপনাকে নিশ্চয়ই কথা দিচ্ছি। আর তা ছাড়া ধরুন না শম্পাই এসবের মূল! তা নইলে সিঁড়িটা এমন কিছু খারাপ না। শম্পা আমার সঙ্গে লাগবে ব'লে—"

// বাধা দিয়ে মহেশবাবু বললেন, "শম্পা ছেলেমানুষ, সেই বা শুধু শুধু তোমার সঙ্গে লাগতে যাবে কেন ?"

"সে তো বটেই। শম্পা তো ছেলেমানুষ। ওর আর কী দোষ বলুন। আসলে মিস্ চ্যাটার্জি-ই ওকে দিয়ে সব করাচ্ছে। এই দেখুন না, আমার কোচিংটার কী অবস্থা করেছে। হ্যাঁ স্যার, ভালো কথা মনে পড়েছে। আপনি শম্পাকে কথাটা বলেছিলেন ?"

"কী বল তো ?"

"আমার কোচিংটার কথা। ছুটির পর বিনা-পয়সায় মেয়েদের পড়ালে, কে আর টাকা দিয়ে আমার কোচিং-এ পড়তে আসবে বলুন। ফলে কোচিং তো বন্ধ হবার যোগাড। আর বুঝতেই তো পারছেন, বাড়ীটা তুলতে শুরু করে দিয়েছি।"

মহেশবাবুর মনে পড়ল, তিনি একদিন বলেছিলেন শম্পাকে কথাটা। শম্পা বলেছিল, ইলেভ্ন্ ক্লাসের সিলেবাস বড়দি বোধহয় ভুলে গেছেন। ক্লাসে গিয়ে থীয়োরি বোঝান না। কতকগুলো অঙ্ক দিয়ে বলেন, বাড়ী থেকে কষে আনতে। না পারলে, পরামর্শ দেন বাড়ীতে প্রাইভেট-টিউটর রাখবার। ফলে অনেক মেয়েই ওঁর কোচিং-ক্লাসে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও তো একই অবস্থা। তা ছাড়া, বাড়ী-তৈরি, পরীক্ষার খাতা দেখা, নোট লেখা, স্কুলে বই ধরানো—এসব সাত ঝামেলায় উনি এত ব্যস্ত থাকেন যে, ক্লাস নেবার সময়ই পান না। তাই যে-সব মেয়েদের সামনে পরীক্ষা, তারা শম্পাকে ধরেছিল, সাহায্য করবার জন্য। এতে শম্পা 'না' বলতে পারেনি। এমন কয়েকটি মেয়ে আছে যারা ওঁর কোচিং-এ টাকা দিয়ে যাচ্ছে নিয়মিত, কিন্তু পড়তে আসছে শম্পার কাছে। মহেশবাবু শম্পার কথার উত্তর দিতে পারেননি। চুপ করেছিলেন।

তাই এখন মালতীর কথায় উনি বললেন, "দেখ মালতী, শিক্ষক হিসেবে আমি তার এ-কাজকে কী করে বাধা দিই ?"

মালতী একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, "তা বেশ। আমি তাহলে শম্পার কেস্টা কমিটিতে তুলব।"

একটু উদাসীন কণ্ঠে মহেশবাবু বললেন, "তা তুলো। তবে সেখানে তো আর কোচিং-এর ব্যাপার তুলতে পারবে না। কেননা, তাতে তোমারই অসুবিধে। আর হ্যাঁ, নেক্সট্ কমিটি-মীটিং-এই বোধহয় তোমার সিঁড়ির ব্যাপারটা উঠবে।" বলে মনে মনে হাসলেন উনি।

প্রতীক্ষিত ফল ফললো। মালতী ব্যস্ত হয়ে বলল, "আমি বলছিলাম কি, শম্পার ব্যাপারটা এখন থাক্। আমি একটু বুঝিয়ে বলি, আপনিও একটু বলুন। হাজার হোক, ছেলেমানুষ তো। এখনও তেমন অভিজ্ঞতাই হয়নি। আর আমি ডক্টর মল্লিক, ডক্টর পাল দুজনকেই আপনার কথা বলেছি। আগামী মীটিং-এ ওঁরা আপনাকে সাপোর্ট্ করবেন। তবে অ্যাকাউন্ট্টা ওঁদের কন্ভিন্সিং হওয়া চাই।"

মহেশ ঘাড় নেড়ে বললেন, "ঠিক আছে, তোমাকে আর কিছু ভাবতে হবে না। বাকী ব্যাপার আমি ম্যানেজ করে নেবো।"

মালতী চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, "তাহলে স্যার, আজ চলি। আপনি কাইণ্ড্লি স্যার, শম্পাকে একটু বলবেন। বাড়ীটা আরম্ভ করেছি, এখন যদি কোচিং-টা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে—"

"আচ্ছা আচ্ছা, সে হবে'খন—বলে মহেশ ব্যস্তভাবে উঠে পড়লেন।

১১

শেষ করে দিস আপনারে তুই প্রলয়-রাতের ক্রন্দনে"

—রবীন্দ্রনাথ

অমরেশ কিছুতেই বুঝতে পারেনা, মাঝেমাঝে বীথির কি হয়। যে গীটার-শেখানো নিয়ে এত ঘনিষ্ঠতা, সেই গীটার পড়ে থাকে, ঘনিষ্ঠতাও দেখা যায় না। আগে আগে অমরেশ মনে করতো, ঘনিষ্ঠতাটুকু যাচিয়ে বাজিয়ে নেবার জন্যে বীথির এ একধরণের খেলা। কিন্তু অর্থে, বিত্তায়, সামাজিক মর্যাদায় সে যখন ব্যারিস্টার চ্যাটার্জিদের সমগোত্রীয়, তখন আর বীথির এত ভাবনার কি আছে। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলে খুব আনন্দের সঙ্গেই তিনি রাজী হয়ে যাবেন। তাঁর মেয়েকে তো তিনি জানেন। দু'বার বি. এ. ফেল করে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছে। রূপ যাও-বা ছিল, স্বাস্থ্যের অপ্রাচুর্যে সেটা খুব আকর্ষণীয় নয়। অত্যন্ত আদুরে কথাবার্তা। ও মেয়েকে ভালো লাগাই বিচিত্র। অমরেশও সে-কথা ভেবেছে। বিশেষ করে শম্পাকে পাশে রেখে। সেখানে বীথি দাঁড়াতেই পারে না। তবু বীথিকে তার ভাল লাগে। কিন্তু শম্পার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে, তার সঙ্গে কথাবার্তা বললে, মনটা তখন শম্পাকে ছাড়া আর কাউকে ভাবতে পারে না। শম্পার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আছে রূপের এবং রুচির প্রভাব ; আছে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য। কিন্তু তাইতেই মুশকিল

হয়েছে অমরেশের। শম্পার আকর্ষণটা তীব্র ; কিন্তু সংযম এবং সংস্কারের বেড়া দিয়ে শম্পা নিজেকে এমনভাবে ঘিরে রেখেছে যে, বিয়ের আগে অমরেশের প্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতা সেখানে পাবার নয়। তাই বীথির কাছে আসতে হয় সেই প্রয়োজনে। আর সেদিকে বীথির কাছে কোন শাসনের বালাই নেই। দাক্ষিণ্য প্রচুর। অমরেশ অনেক ভেবে ঠিক করেছে, শম্পা যেন একটা আইডিয়া। আর বীথি রক্তমাংসের একটা মানুষ। তাই বলে যে সে বীথিকে বিয়ে করবে, এমন কথা সে মোটেই ভাবেনি। ন্যাকা-ন্যাকা, পুতুল-পুতুল ভাব মেয়েটার পাশে শম্পার বলিষ্ঠ জীবন্ত মূর্তিটা তার কাছে অনেক বেশী আগ্রহের সঞ্চার করে। কিন্তু তা বলে তো বীথির অভিমান না ভাঙিয়ে পারে না। অন্য অন্য বার বীথি কেমন যেন উদাসীন ভাব দেখাত। কেমন যেন নিস্পৃহা অমরেশ সম্বন্ধে। বার বার বলতে হ'ত, কী হয়েছে বীথি? লক্ষ্মীটি, বলবে না? অনেকক্ষণ মন্ত্রোচ্চারণের পর বীথি হয়তো বলল, ওর আজকাল মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওকে ভালবাসছে না। ওর কথা শুনছে না। তা নইলে ওর অত আদরের জিমি ওর হাত থেকে বিস্কুট খেয়ে, ওর ডাকে কর্ণপাত না করে, ঝোলা কান-দুটো দুলিয়ে গর্‌গর্‌ করতে করতে চলে যায়! আর পুসিটাই বা কী! সোফায় শুয়ে শুয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে একটু আদর করতে না করতেই, ফ্যাঁস্ করে মুখ ভেঙচে চলে গেল! এর পর বীথির চোখের জল বোধহয় আর বাধা মানতে চায় না। ফলে অমরেশকে ঠোঁট কামড়ে ওকে কাছে টেনে সান্ত্বনা দিতে হয়—তাতে কী হয়েছে। আমি তো তোমাকে ঠিক আগের মতোই ভালবাসি বীথি।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। বীথি কেমন যেন থম্‌থমে হয়ে রয়েছে। অমরেশের স্তোকবাক্যে যেন আরও বেশী গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। অথচ অমরেশের আজ আর বেশী সময় দেবার উপায় নেই। শম্পার সঙ্গে ওর একটা এনগেজমেন্ট আছে এখানেই। শম্পা আসবে ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে। স্কুল সংক্রান্ত ব্যাপারে। অমরেশের ইচ্ছে ছিল, শম্পার সঙ্গে বীথির আলাপ করিয়ে দেবে প্রথমে। তারপর বীথির মাধ্যমেই ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে শম্পার। অমরেশের আর একটা উদ্দেশ্যও ছিল। শম্পার সঙ্গে বীথির পরিচয়টা করিয়ে দিয়ে ও যেন শম্পার কাছে বীথির ব্যাপারটা গোপন করার অপরাধের কিছুটা স্খালন করতে চাইছিল। শুধু তাই নয়। বীথিকেও একটু সচেতন করে রাখতে চাইছিল যাতে শম্পা-অমরেশ প্রসঙ্গে ও হঠাৎ যেন আঘাত পেয়ে না বসে।

অনেকক্ষণ ধরে অমরেশের সাধ্য-সাধনা ব্যর্থ হবার পর সে কেমন যেন বিরক্তি বোধ করল। ভাবল, আজকের মত ক্ষান্ত দেওয়া যাক। বরং ড্রইংরুমে গিয়ে কিছুটা সময় মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলতে বলতে শম্পার জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে। এই ভেবে চুপচাপ বসে রইল একটু।

তারপর কিছুটা সময় নীরবে অতিবাহিত হবার পর, অমরেশ গম্ভীর ভাবে বলল, "আজ চলি।"

বীথি কোন উত্তর দিল না। একটি বিষাদ-খিন্ন পুতুলের স্তব্ধতা নিয়ে চুপচাপ সোফায় বসে রইল। অমরেশ শেষ চেষ্টা করল. আর একবার 'যাচ্ছি' বলে। তাতেও কোন প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। বাধ্য হয়ে অমরেশ উঠে পড়ল।

দরজার কাছে এসে ফিরে তাকাতেই দেখল, বীথি সোফার পিঠে মুখ লুকিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচল অমরেশ। আবার ফিরে এলো। কিছুক্ষণ কাঁদলেই মনের অস্বাভাবিকতাগুলো দূর হয়ে যাবে। আর তখন বীথিকে সহজ করা সহজতর হবে।

সোফার কাছে এসে মাথায় হাত বুলিয়ে, "ছি, ছি, একি হচ্ছে বীথি" বলতেই বীথি দ্বিগুণ বেগে কেঁদে উঠল।

অমরেশ পাশে বসে পড়ে ওর চোখের-জলে-ভিজে মুখখানা তুলে ধরতেই, ও অমরেশের বুকে মুখ রেখে ফোঁপাতে লাগল। আবেগটা কথঞ্চিৎ শান্ত হলে অমরেশ অনুরাগ-শিঞ্জিত কণ্ঠে বলল, "এবার বল তো লক্ষ্মীটি, কী হয়েছে?"

"তুমি,—তুমি—" বলতে গিয়ে আবার ফুঁপিয়ে উঠল বীথি, "তুমি কেন আমাকে ঠকালে?"

এবারে আকাশ থেকে পড়ার পালা অমরেশের।

"কি বলছ তুমি!"

"কী বলছি, কিছু যেন জান না", ভেজা-ভেজা, ফুলো-ফুলো চোখে বীথি তাকালো।

"কি বলছ, বিশ্বাস করো, সত্যি আমি বুঝতে পারছি না। লক্ষ্মীটি, খুলে বল, কী হয়েছে।"

"তুমি—তুমি শম্পাকে বিয়ে করবে, এ-কথা আমাকে আগে জানাওনি কেন?"

আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলল বীথি।

কী সর্বনাশ! জল যে এতদূর গড়াতে পারে, অমরেশ তা ভাবেইনি কোনদিন।

"ছি, ছি, এসব কথা তোমাকে কে বলল? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! শম্পার সঙ্গে আলাপ থাকাটা যদি অপরাধ হয়, তাহলে অবশ্য আমার বলবার কিছু নেই।"

অমরেশ পাল্টা অভিমান দেখিয়ে বলল।

"আলাপ থাকা অপরাধ কে বলছে", মুখ গোঁজ করে উত্তর দিল বীথি, "কিন্তু আমি যে শুনলাম—"

অভিমানে বীথির কথা আটকে গেল।

"যে তোমায় বলেছে—সে নিশ্চয় তোমাকে নিয়ে আমাকে ঈর্ষা করে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

বেশ দৃঢ়কণ্ঠে বলল অমরেশ। সত্যিই সে এ-বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিল। অমরেশের কিন্তু ভুল হয়েছিল। অবশ্য অমরেশের কথায় বীথি খুশী হল।

বীথিকে কেউ কিছু বলেনি। ও একটা বেনামী চিঠি পেয়েছিল।

"কিন্তু আমি জানি, শম্পা তোমাকে কী চোখে দেখে। সেটাও কি বাজে কথা ব'লে উড়িয়ে দেবে

"ওসব আমি জানি না, বীথি। শুধু জানি শম্পাই আসুক আর যেই আসুক, এই ঘরের দরজা থেকে তাকে রিক্ত হাতেই ফিরে যেতে হবে।"

আর অমরেশের উক্তিটাকে অতি-নাটকীয় তৃতীয় অঙ্কের পর্যায়ে ফেলতেই যেন সঙ্কুচিত পদক্ষেপে শম্পা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। ব্যাপারটা একটু কাকতালীয়বৎ মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়। শম্পা বার-দুয়েক ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। অমরেশ বলেছিল, ও আগে ওনার সঙ্গে কথা বলে রাখবে। কিন্তু অমরেশের আর কথা বলে রাখা হয়ে ওঠেনি।

ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে শম্পার দেখা করার আগ্রহটা অমরেশ বা অরূপ দুজনেই সমর্থন করেনি। ওদের মনে হয়েছে, শম্পা শুধু শুধু নিজেকে জড়াচ্ছে ব্যাপারটার সঙ্গে।

.

স্কুলের একটি মেয়ে নীচে নামবার সময়ে ভাঙা সিঁড়ি থেকে পড়ে যায়। রেলিং না থাকায় সে একেবারে নীচে এসে পড়ে। কংক্রীট করবার সময়ে যে

শিকগুলো বেরিয়ে থাকে, তার একটা মেয়েটির পাঁজরের মধ্যে ঢুকে যায়। মেয়েটি বর্তমানে হস্‌পিটালে রয়েছে। অবস্থা তার আশঙ্কাজনক। কিন্তু এরই মধ্যে হেডমিসট্রেস উকিলকে নিয়ে হস্‌পিটালে ধাওয়া করেছেন। মেয়েটির জ্ঞান ফিরে আসতে-না-আসতেই, উকিলবাবু তাকে জিগেস করেছেন, আম কিংবা কলা খেতে ভালবাসে কিনা। যেদিন সে পড়ে যায়, সেদিন আম কিংবা কলা খেয়েছিল কিনা। কিংবা অন্য কোন মেয়েকে খেতে দেখেছিল কিনা। ইত্যাদি। মেয়েটির বাবা অবস্থাপন্ন। তিনি হেডমিস্‌ট্রেসের কাছে ভাঙা সিঁড়ির কৈফিয়ত চান। হেডমিস্‌ট্রেস তাঁকে কড়া কথা বলে ভাগিয়ে দিয়েছেন। ভদ্রলোক ঠিক করেছেন, কেস্‌ করবেন। কয়েকজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে এই ব্যাপারে সাহায্যও চেয়েছেন। শম্পাই তখন তাঁকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাঙা সিঁড়ির সমস্ত ইতিহাস জানিয়েছে। এমনকি এটুকু জানাতেও কুণ্ঠিত হয়নি যে, হেডমিস্‌ট্রেসের যে বাড়ী তৈরী হচ্ছে, তার সিমেণ্ট ও লোহার পারমিটটা তাড়াতাড়ি এসে যায়। তখন ওর হাতে টাকা না থাকায় উনি স্কুলের সিঁড়ি মেরামত করার হাজার-দুয়েক টাকা দিয়ে ওঁর বাড়ীর সিঁড়িটা তৈরী করে ফেলেছেন। তা নইলে, একতলাটি ভাড়া দিয়ে দোতলায় বাস করা যায় না। কতদিন আর মাসে মাসে একশো কুড়ি টাকা বাড়ীভাড়া দেওয়া যায়।

মেয়েটির বাবা রামকান্তবাবু শম্পার সঙ্গে পরামর্শ করে কেস্‌-এর দায়িত্ব ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির হাতে দিতে চেয়েছেন। শম্পা অমরেশকে বলেছিল, ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে। অমরেশ 'নিয়ে যাব' 'নিয়ে যাব' করে আর নিয়ে যাবার সময় করে উঠতে পারছে না। এদিকে রামকান্তবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তাই শেষ পর্যন্ত শম্পা নিজেই এসেছে ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে।

শুধু অমরেশকে বলে রেখেছিল, আজ ও আসবে।

শম্পা ভেবেছিল, অমরেশ না থাকলে প্রথমে বীথির সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দেবে, অমরেশের বন্ধু বলে। বীথি তার নামও জানে। সুতরাং অসুবিধে হবে না কিছু। তারপর বীথির মাধ্যমে মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করে কেস্‌-এর ব্যাপারটা বলে তাঁর সাহায্য চাইবে। গেটে তাই দারোয়ানকে দিদিমণি কোথায়, জিগেস করেছিল। একজন চাকর তাকে দোতলার করিডোরে পৌঁছে দিয়ে ঘর দেখিয়ে চলে গেল।

দেওয়াল থেকে ঝোলানো লম্বা লম্বা পেন্টিংগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে শম্পার পদক্ষেপ কেমন যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। স্ট্যাণ্ডের ওপর পেতলের ফুলদানিতে রাখা পাতাবাহারের গাছগুলোর পাশেই নেটের পরদা লাগানো দরজা। আবছা একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে। পর্দা সরিয়ে মুখ বাড়ালো শম্পা।

চট্ করে সরে আসবে কিনা ভাবতে ভাবতেই অমরেশের কথা এবং দৃষ্টি শম্পাকে ছুঁয়ে ফেলল। অমরেশ দেখে ফেলবার পর, সরে আসবে কিনা ভাবতে আর কয়েকটা মুহূর্ত।

বীথিও অমরেশের দৃষ্টি অনুসরণ করে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল।

শম্পা একটু সঙ্কুচিত হাসি ফুটিয়ে অমরেশকে ইঙ্গিত করে বললে, "শোন।" তারপর দরজার ধার থেকে সরে এসে দেওয়ালে টাঙানো একটা কাংড়া-স্কুলের ছবি দেখতে লাগল।

কাংড়া-স্কুলের ছবি কী, শম্পা জানে না। কোন একটা মাসিকপত্রিকায় কাংডা স্কুলের কতকগুলো ছবি বেরিয়েছিল। এই ছবিটা অনেকটা সেইগুলোর মতো বলেই শম্পার মনে হল ছবিটা কাংড়া স্কুলের। শম্পা ছবিটা দেখছে তো দেখছেই। বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়েই দেখছে। ছবিটা যে ওকে আকৃষ্ট করে রেখেছে তা নয়। দরজা থেকে সরে এসে ছবিটার দিকে তাকাতেই ও যেন মনটাকে ধরে রাখার একটা অবলম্বন পেয়েছিল। ও কোথায় এসেছে, কেন এসেছে, কার কাছেই বা এসেছে,—ঠিক এই মুহূর্তে কোন প্রশ্নই ওকে আর আকর্ষণ করে রাখতে পারছে না। স্থান কাল পাত্রের বেড়ার বাইরে চলে গিয়ে ওর মনটা যেন হারিয়ে যেতে চাইছে। ও শুধু ছবিটার দিকে তাকিয়েই আছে। কালের চেতনা হারিয়ে ফেলে ওর যেন মনে হচ্ছে অনন্ত কাল ধরে ও ছবিটা দেখছে। যে মুহূর্তে ওর ছবি দেখা থেমে যাবে, সেই মুহূর্তেই যেন রাশি রাশি চিন্তা এসে ওকে আক্রমণ করবে বলে আশেপাশে ওৎ পেতে বসে আছে। কে এঁকেছে ছবিটা? আর. ও. বি.—তারপর কী? ঠিক বোঝা যাচ্ছেনা। একটা মেয়ে—না, না, দুটো—আকাশে ওগুলো মেঘ নাকি! উঃ, কতক্ষণ হয়ে গেল! আধঘণ্টা হবে? আরে না না, মাত্র একমিনিট!

পর্দা ঠেলে অমরেশ বেরিয়ে এল। মুখটা একটু গম্ভীর-গম্ভীর। যেন একটা জরুরী কাজে ব্যস্ত ছিল। ডাক শুনে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। শম্পাও যেন

ওর দেরি করিয়ে দিতে চায় না। ওকে দেখেই কেমন যেন একটু শশব্যস্তে বলে উঠল, "আমি ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তুমি কি—"

"ওঃ হ্যাঁ, এস—"

যেন এন্‌গেজ্‌মেন্ট্‌ করাই ছিল। অমরেশ দ্রুতপায়ে বারান্দার আর এক-প্রান্তের ঘরে এসে ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে শম্পার পরিচয় করিয়ে দিল। শম্পাও সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দিল। অমরেশ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করল।

তারপর আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

অমরেশ ফিরছিল বীথির ঘরের দিকে। শম্পার সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছুই ভাবছিল না। ওর সম্বন্ধে সমস্ত ভাবনাই যেন কবে শেষ হয়ে গিয়েছে! কিছুই যেন আর ভাববার নেই। একটু আগেও বীথির কাছে যখন শম্পার কথা বলছিল, তখন শম্পার প্রতি ওর মনোভাবকে মনের সবটুকু সতর্কতা দিয়ে আগলে রেখেছিল। আর করুণা হচ্ছিল বীথির ছেলেমানুষী দেখে। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, শম্পার সঙ্গে ওর অনেক অনেকদিন আগে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তারপর কবে থেকে যেন সে ঘনিষ্ঠতা একটু একটু করে ক্ষীণ হতে সুরু করেছে। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে সে ঘনিষ্ঠতা কবেই যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু স্মৃতিটুকু পড়ে আছে। উজ্জ্বল বর্ণ-প্রলেপে আঁকা পুরোণো সুখের স্মৃতি। কালের পদবিক্ষেপে ম্লান। সে স্মৃতি সেদিনের আনন্দ-ঘন মুহূর্তগুলির চকিত পরশ দিয়ে যায়। শিব শির করে ওঠে মনটা। তারপরই ভারী হয়ে আসে একটা বেদনা-ঘন অনুভূতিতে।

কেন এমন হল? একটা মাত্র ঘটনায় ওদের এতদিনকার যোগসূত্র সব ছিন্ন হয়ে যাবে? কোথাও থাকবে না ছিন্নসূত্র পুনর্যোজিত করবার এতটুকু আশা?

না, থাকবে না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবল অমরেশ। ওদের সম্পর্কের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল অংশটুকুই যে অমরেশ শম্পার কাছে গোপন করে রাখতে চেয়েছিল। আর ঠিক আঘাত পেল সেইখানেই।

বীথিকে স্তোক দেওয়া সোজা। কেন না ওর মনটা যেন সন্দেহ নিরসনের জন্য তৈরী হয়েই আছে, শুধু তাই নয়, ও অনেক হিসেবী। লাভের আশায় ও সহজেই কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করে নিতে পারে। শম্পার হিসেব কোনদিন

মেলবার নয়। ওর মনের ছন্দের সঙ্গে না মিললে, এক নিমেষে ও জমার ঘরের অঙ্ক খরচের খাতায় ফেলতে এতটুকু ইতস্ততঃ করবে না। তাই আজকের ঘটনার পর শম্পা সব কিছু বলা-কওয়ার অতীত হয়ে গেছে। আর ওকে ফিরিয়ে আনা যাবে না।

হঠাৎ বুকের মধ্যে ছুঁচ বেধার মত একটা তীব্র যন্ত্রণা যেন বুকটা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসত চাইল। বীথির ঘরের দিকে এগোতে এগোতে অনুশোচনার একটা সুতীক্ষ্ণ গ্লানি করাতের মত ওর মনটাকে একটু একটু করে চিরতে লাগল। আর অমরেশ সেই ক্ষতস্থানের যতই গভীরে দৃষ্টিপাত করতে লাগল, শুধু দেখল, শম্পা, শম্পা আর শম্পা!

বীথির ঘরের দরজার নেটের পর্দাটা ঈষৎ হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে। অমরেশ দেখল। যন্ত্রণার বিধে নীল দৃষ্টি মেলে। শুনল তার অকিঞ্চিৎকর আহ্বান। আস্তে আস্তে ও দরজার কাছে এগিয়ে এলো। বীথির অধ্যায়টা কি জীবনের পাতায় শেষ করে দিলে ভালো হ'ত না!

নিঃশ্বাস ফেলে অমরেশ একটা সিগারেট ধরাল। বীথির ঘরে ঢুকতে গিয়ে কাংড়া স্কুলের ছবিটা নজরে পড়ল অমরেশের। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির এটা একটা দুর্লভ সংগ্রহ। বর্ষার আগমন। কতদিন বীথির ঘরে ঢোকবার সময়ে এই ছবিটা দেখে অমরেশের মনে গুন্‌গুন্ করে উঠেছে—'পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে'। ঘরে ঢুকে বীথিকে গীটারে ঐ সুরটা শেখাতে চেষ্টা করেছে। তারপর একসময়ে নিজেই আগাগোড়া গানটা বাজিয়ে গেছে। আজ বীথির ঘরে ঢুকতে গিয়ে গানটার দ্বিতীয় কলিটা অমরেশের মনে হল—'মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে'।

বীথি *Film-Fare*-এর পাতা ওল্টাচ্ছিল। অমরেশকে ঘরে ঢুকতে দেখে জিগেস করল, "মেয়েটি কে?"

সহজ এবং নিস্পৃহ কণ্ঠে অমরেশ বলল, "ঐ তো শম্পা।"

বীথির মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, "ও-ই? তা এখানে?"

"তোমার বাবার কাছে, একটা মোকদ্দমার ব্যাপারে এসেছে।"

"ও! আমাদের দুজনকে দেখে—"

"বীথি! আর দেরি করা ঠিক নয়। আমার মনে হচ্ছে, তোমার বাবাকে এবার বলি।"

বীথি মুখ নীচু করে নোখের পালিশ লক্ষ্য করতে করতে বলল, "তাই বোলো।"

কেস্‌টা শুনে মিঃ চ্যাটার্জি খুশী হলেন। কেস্‌টার সঙ্গে যখন পাব্‌লিক্ ওয়ার্ক্ জড়িত, তখন তাঁর নিতে কোন আপত্তি নেই। নানা কেসে বিস্তর পয়সা করেছেন। এবার তাঁর ইচ্ছে, একটু পাবলিক্ ওয়ার্ক্ করা। সারাজীবন অর্থ-উপার্জনের ফাঁকে ফাঁকে দেশের জন্য অনেক চিন্তা করেছেন। এবার একবার হাতে নাতে কিছুটা কাজ করতে চান। তাঁর দীর্ঘ দিনের চিন্তাপ্রসূত ফল, দেশকে যতটা পারেন, দিয়ে যেতে চান। শম্পা তাঁকে আজ সেই সুযোগ এনে দিচ্ছে বলে খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। শম্পাকে উৎসাহ দিলেন। বললেন, তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচীতে যদি শম্পার সাহায্য পান, খুশী হবেন। উপস্থিত কেস্‌টা তিনি অর্ধেক ফী-তে করতে রাজী হলেন।

মিঃ চ্যাটার্জির কথাগুলো শুনতে শুনতে শম্পার মনে হল, তাদের জীবনগুলো যেন এঁদের কাছে জীবন নয়। এঁদের জীবনের কতকগুলো উপকরণ মাত্র। যাই হোক, পরের দিন রামকান্তবাবুকে এনে কাগজপত্র ঠিক করা হবে, এই স্থির হলে পর শম্পা উঠল।

মিঃ চ্যাটার্জির বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসে ট্রাম নিল শম্পা। জানলার ধারে বসতেই হাওয়ার স্পর্শে ওর চূর্ণ কুন্তলগুলো চঞ্চল হয়ে পড়ল। আর তখনই শম্পা বুঝতে পারল, ওর কপালটা কিরকম গরম হয়ে উঠেছিল। মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গে কেস্-এর আলোচনাগুলোই বার বার মনে পড়ছে। অমরেশের কথা মনে আসতে চাইছে না। প্রথমে একটা উকিলের চিঠি দিতে হবে। তাতে থাকবে... দেবেশ, অরূপ, এরা কি ঠিক এই কথাটাই বলতে চাইত। আর—হ্যাঁ, রামকান্তবাবুকে বলতে হবে.. হস্‌পিটালের মেডিকেল সার্টিফিকেট্‌টা ··মিঃ চ্যাটার্জিরা এবার সবাই কার্সিয়াং গিয়েছিলেন। জ্বালাতন, . মেয়েটাকে এখন কয়েকদিন স্কুলে পাঠানো বন্ধ করতে হবে। হেড মিস্‌ট্রেসের কী হবে! চাকরি চলে যাবে না তো! না, তা বোধহয় যাবে না...কিন্তু অমরেশ তার কাছে কিছুই কি পেত না! আর যদি কিছু নাই পেয়ে থাকে তাহলে শুধু শুধু আসতই বা কেন? আঃ—! মহেশবাবু এবার নিশ্চয় মালতীদির হয়ে দাঁড়াবেন না। অরূপ বোধহয় মহেশবাবুর ওপর চটে আছে। এবারে নিশ্চয়

...এক হতে পারে, অমরেশ ওকে করুণা করে ওর সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে গেছে। মানুষ চিনতে শম্পার এত বড় ভুল হল! আর সেই ভুলের সুযোগেই এল নারী জীবনের চরম অপমান! ছিঃ ছি! অরূপরা কি ওর ভুল ভেঙে দিতে চেয়েছিল। নাঃ,...অরূপদের এবারের ফাংশানটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।...বীথি বোধহয় ভালো গীটার বাজাতে পারে...কোন্ গানটা যেন ...হচ্ছিল যখন...দর্শকরা হৈ-হৈ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল। . কোন্ গানটা যেন···'পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে'·· আশ্চর্য, অত সুন্দর গানটা...মনের মধ্যে সুরটা গুন্‌গুন্ করে উঠল—

"বেদনা তোর বিজুল শিখা জ্বলুক অন্তরে।
সর্বনাশের করিস সাধন বজ্র-মন্তরে,
অজানাতে করবি গাহন,
ঝড় সে পথের হবে বাহন,
শেষ করে দিস আপনারে তুই
প্রলয়-রাতের ক্রন্দনে।"

১২

"চিরদিন আমি পথের নেশায় পাথেয় করেছি হেলা"
—রবীন্দ্রনাথ

একে একে অনেকেই এলেন অভিনন্দন জানাতে। স্মিতহাস্যে বিনয়-বচনে সকলকে আপ্যায়িত করলেন মহেশবাবু। কিছুক্ষণ আগে কমিটি মীটিং-এ মহেশকে হেড-মাস্টার-এর কার্যভার দেওয়া হয়েছে। পুরোনো হেড-মাস্টারমশাই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলেন তাঁর বার্ধক্যের অনবধানতায় সত্যিই স্কুলের প্রচুর টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে, তিনি অকম্পিত হস্তে পদত্যাগ-পত্র লিখে দিলেন।

সবচেয়ে উৎসাহী বিরূপাক্ষবাবু। "স্যার, এবারে আমাদের কোচিং ক্লাসগুলো যেন ভালো চলে তার বন্দোবস্ত করবেন। এতদিন তো সত্যবাবুরা দুধের সরটুকু মেরে এসেছেন। দেখি এবারে, ওনারা কী করেন।"

ভজহরি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "অত ঝুট্-ঝামেলায় যাবার দরকার কি? কোশ্চেন ছাপানোর ব্যাপারগুলো স্যার, আপনি আমাদের হাতে ছেড়ে

দেবেন। এসব বাজে কাজে মন না দিয়ে আপনি স্যার স্কুলটার উন্নতির দিকে একটু লেগে যান। আমাদের মাইনে-টাইনে কিছু বাড়ুক। তা নইলে আর ভদ্রস্থ থাকা চলছে না।"

মহেশবাবুর বুকটা একটু কেঁপে উঠল। সেটাকে দমন করে বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, সে সব দেখা যাবে।"

নরেনবাবু বলে উঠলেন, "সবই তো হল। এবারে স্যার দেখবেন, আমার ছেলেটা যেন পাস করে।"

মহেশবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সে তো আমাদের কর্তব্য।"

বিরূপাক্ষ চটে গিয়ে বললেন, "আপনি আচ্ছা লোক তো মশাই! স্যারের ওপর সাড়ে বারোশো ছেলের শিক্ষার ভার। আর উনি বেছে বেছে আপনার ছেলেটিকেই দেখবেন?"

নরেনবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "না, না, তা নয়, মানে বলছিলাম কি—"

"বলবেন আবার কি", ঝাঁঝিয়ে উঠলেন ভজহরিবাবু, "পাস করাতে চান তো আমার কোচিং-এ দিন। আমার কোচিং ক্লাসটা তো আপনার বাড়ীর কাছেই। বুঝতেই পারছেন, এবারে আর সত্যবাবুদের ওখানে তেমন সুবিধে হবে না।"

ভজহরির কথা শুনে বিরূপাক্ষ নিজের ওপর ভারী রাগ করলেন। এরকমভাবে বলবার সুযোগ তিনিই প্রথম পেয়েছিলেন।

"ওসব কথাগুলো স্যারের সামনে না-হওয়াই ভালো। ও আপনারা অন্য সময়ে সেরে নেবেন।" বিরূপাক্ষ বললেন, "কিন্তু স্যার, একটা কথা আপনাকে বলতে চাই।"

"বলুন।" ব্যস্তভাবে বললেন মহেশ।

"জীবতোষবাবুর এক্স্টেন্শান্-এর সময় হয়ে আসছে। ওঁকে দেবেন কিনা, ভেবে দেখবেন।"

"সেকি কথা! জীবতোষবাবু আর সত্যবাবু, এঁরা দুজন খুব নামকরা শিক্ষক। স্কুলের স্বার্থেই এঁদের রাখা উচিত।"

"মোটেই তা নয়, স্যার, ওসব আপনাদের প্রি-ওয়ার ধারণা। ওসব এখন চলে না। একটা সাইন-বোর্ড, আর গোটাকতক চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চি থাকলেই ছেলের দল হু-হু করে আসবে। স্কুলে কিরকম মাস্টার আছে, কিরকম

পড়াশোনা হয়, এসব নিয়ে ছেলেরাও মাথা ঘামায় না। অভিভাবকেরাও নয়।

বিরূপাক্ষবাবু কথা শেষ করতেই ভজহরিবাবু ধরলেন, "আর মাথা ঘামিয়েই বা করবে কি ? এতো ছেলে যে পড়বে, ততো স্কুল কোথায় ? কোন-রকমে একটা স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়ে রাখা বই তো নয়।"

"আহা তা না-হয় হল", মহেশবাবু বললেন, "কিন্তু জীবতোষবাবুকে এক্‌স্‌টেনশান্ না দেওয়ার কারণ কী ?"

"এই-যে এতবড ব্যাপারটা হয়ে গেল, এতে উনি আপনাকে কোন সাহায্য করেছিলেন ?"

"তা হয়তো করেননি। কিন্তু উনি তো ঠিক—"

"না স্যার, ও-সমস্ত আর চলবে না। হয় এ-দল, না হয় ও-দল। দু-দল শুঁকে বেড়ালে চলবে না।"

ভজহরি ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্য বললেন, "আচ্ছা, সে যা-হয় পরে দেখা যাবে'খন ; এখন স্যার, কবে খাওয়াচ্ছেন বলুন।"

"বেশ তো, বেশ তো—" মহেশবাবু উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। এদের সঙ্গে কথাবার্তাটাকে শেষ করতে পারলে উনি বাঁচেন। ওঁকে এখনই একবার ডক্টর সমাজপতির কাছে যেতে হবে। বিশেষ দরকার। আজকের মীটিং-এ সাফল্যের অর্ধেক গৌরবই বোধহয় মালতীর প্রাপ্য। সেটা আর কেউ না বুঝলেও, মহেশ এবং মালতী উভয়েই ভালো করে বুঝেছেন। সুতরাং এবার মালতীর জন্যে একটা কিছু করা দরকার। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি খুব উঠে-পড়ে লেগেছেন। ওনার নাকি খুব পাবলিক্ ওয়ার্ক্ করবার শখ হয়েছে। ঠিক আছে। ঐ শখেতেই মালতীকে বাঁচাতে হবে। আর তার জন্যই একবার সমাজপতির কাছে যাওয়া দরকার। ডক্টর সমাজপতি মহেশের বাল্যবন্ধু।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। অন্ধকার ঘরে চুপচাপ বসে ছিল অরূপ। বাঁ-দিকে পশ্চিমের জানলায়, পাশের বাড়ীর ছাদের ওপর এরিয়েল-লাগানো একটুকরো আকাশ আঁটা। রঙটা তার গাঢ় নীল থেকে প্রায় কালোর কাছাকাছি। মাঝে মাঝে একটু লালের ছোঁয়া। অরূপের হাতে ধরা খামখানায় টক্‌টকে লাল রঙে 'শুভবিবাহ' কথাটা লেখা। অন্ধকারের জন্য পড়তে না পারলেও, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না। পাশের ঘর থেকে প্রমীলার মৃদু কণ্ঠস্বর এবং শম্পার

চকিত হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। অরূপ জানে, অসুস্থ প্রমীলাকে একটু উৎফুল্ল রাখবার চেষ্টা করছে শম্পা। স্কুলের প্রসঙ্গগুলো মাকে না বললেই হ'ত, ভাবল অরূপ। মা কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য, শম্পা নিজেকে কতদূর যান্ত্রিক করে ফেলেছে! জীবনের সহজ সরল ভাবাবেগগুলো নির্দয় হাতে ও যেন মন থেকে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। কর্তব্য ছাড়া ওর জীবনে যেন আর কিছুই নেই। প্রমীলা অসুস্থ, তাঁকে রোগশয্যায় দেখতে আসা উচিত। তাই এসেছে শম্পা। মুখের ওপর হাসির আবরণটুকু টেনে এনে। তা সে আবরণের তলায় যাই থাক না কেন। কিন্তু কোন নিভৃত মুহূর্তে ওকে কি ওর মনের মুখোমুখি হতে হয় না? সমস্ত আবরণের অন্তরালে আপন জীবনের রুক্ষতা ওকে কি এতটুকুও বেদনার ফল্গুধারায় শিঞ্চিত করে না।

শম্পার ওঠবার আওয়াজ পাওয়া গেল। প্রমীলার কাছে ও বিদায় নিচ্ছে। এবার বোধ হয় ও বাড়ী ফিরবে। এ-ঘরে কি একবার উঁকি মারবে? সম্ভব। প্রাত্যহিক রুটিন মাফিক শম্পা রোজ যাবার সময়ে একবার করে এঘরে আসবে, কথা বলবে অরূপের সঙ্গে। প্রমীলার সম্পর্কে দু-একটা কথা হবে। হয়তো দেবেশের খবর কি, জানতে চাইবে। তারপর ঠিক একসুরে, এক ভঙ্গিতে বলবে, আজ চলি। কোথাও এর এতটুকু ব্যতিক্রম হবে না। এই প্রাত্যহিক রুটিনকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে রক্ত-মাংসের শম্পাকে কি একবারও দেখা যায় না!

কিন্তু কেনই বা সেই মেয়েটিকে দেখতে চাইছে অরূপ! অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল তার। প্রথম যেদিন শম্পার সঙ্গে দেবেশের আলাপ করিয়ে দেয়, ঘটনাটা সেদিনের। সেদিনও অরূপদের বাড়ীতে বসেছিল একটা গানের আসর। শম্পা সেদিন প্রথম ওদের সামনে গান গেয়েছিল। গান শুনতে শুনতে প্রশংসার গুঞ্জন যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছিল দেবেশের দৃষ্টি থেকে। বার বার ও তাকাচ্ছিল শম্পার দিকে। অরূপের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল ওর মন। কিন্তু একটু পরেই কেমন যেন একটা কৌতুকের রসে জারিত হল অরূপ। মনে ভাবল, দেবেশকে নিয়ে, একটু মজা করবার সুযোগ পাওয়া গেছে।

সেদিন আসর ভেঙে যাবার পর একান্তে দেবেশকে ও জিজ্ঞেস করেছিল, কিরে কি রকম দেখলি?'

মিতভাষী দেবেশ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অরূপের দিকে তাকিয়েছিল। ওর পিঠে

একটা থাপ্পড় মেরে অরূপ বলেছিল, "গান তো সবাই এক মনে শোনে, কিন্তু এক দৃষ্টিতে শুনতে তোকেই দেখলাম।"

সংযতচিত্ত দেবেশ হঠাৎ যেন কি রকম লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল, "যা, কি যে বলিস!"

অরূপের মনের ভেতরটা কি রকম যেন চিনচিন করে উঠেছিল। যেন পরীক্ষায় মাত্র দু-এক নম্বর বেশী পেয়ে দেবেশ ফার্স্ট হয়ে গেল। ও চেষ্টা করলে হয়তো সেই দু-এক নম্বর পেতে পারত। কিন্তু তারপর থেকে কোনদিনই আর এভাব তার আসে নি। বরং সবার আড়ালে এই নিয়ে দেবেশকে ঠাট্টা-তামাসা করতে তার ভালোই লাগত। প্রথম দিনই ও দেবেশকে বলেছিল, "উইশ ইউ গুড লাক্, ব্রাদার, কিন্তু রাজকন্যার মনের অন্তঃপুরে বড কঠিন পাহারা।"

দেবেশ ওর কথা শুনে হেসেছিল। জবাব দেয় নি।

অরূপের এই অন্তরালের কৌতুককে দেবেশ কোনদিন বাধা দেয় নি। স্মিত হাসি হেসে চুপচাপ শুনে গেছে। শুধু একদিন আভাসে বুঝিয়েছিল, এসব কথা যেন কোনদিন শম্পার কানে না যায়। পাগল নাকি! অরূপ ভেবেছিল। শম্পার সঙ্গে যতই সে ইয়াকি-ঠাট্টা-ফাজলামি করুক, এসব কথা কোনদিনও সে শম্পার সামনে তুলতেই পারবে না। অরূপের মনে হত, এ সব কথা শম্পাকে বললেই ও হয়তো বলে বসবে, তোমাকে বেশী পাকামো করতে হবে না।

তাই শম্পার প্রতি দেবেশের স্মিত হাসির অঞ্জলিকে পূর্বরাগের লক্ষণ ধরে নিয়ে ও একে একে অনুরাগ থেকে সুরু করে বিরাগ অবধি বিশ্লেষণ করত দেবেশের মনোভাবের। আর মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে চীৎকার করে উঠত, তুই একটা আস্ত গাড়ল। কোনদিন মুখফুটে কোন কথা একটা বলতে পারলি না।

দেবেশ সিগারেট ধরাতে ধরাতে গম্ভীরভাবে জবাব দিত, আঃ থাম। অত চেঁচাস নি।

অমরেশের সঙ্গে শম্পার বিয়ের কথা শুনে অরূপ আঘাত পেয়েছিল। তারপর থেকে আর কোনদিন ও দেবেশকে ঠাট্টা করতে পারে নি শম্পাকে নিয়ে। শম্পার এই আচরণকে কিছুতেই মেনে নিতে পারে নি অরূপ। তার কারণ অমরেশকে কোনদিনই ও ভদ্রজনোচিত পোষাক-পরা লোফার ছাড়া

আর কিছু ভাবতে পারে নি। ভাবতেই পারে নি তাকে শম্পার স্বামীরূপে। অমরেশ যে শম্পাকে ঠকিয়ে চলেছে, এতে ওর কোন সন্দেহ ছিল না। কতবার ও চেষ্টা করেছে শম্পার ভুল ভেঙে দেবার। কিন্তু পারে নি। পারে নি শুধু শম্পা ওদের কথায় কর্ণপাত করতে চাইত না বলে। ওদের বক্তব্য কোনদিনই শম্পা শুনতে চায় নি। তাই মাঝে মাঝে অরূপ রাগত চিত্তে ভাবত, শম্পা বোধহয় একটা বড়লোকের ছেলেকে বিয়ে করবার লোভে আর সব কিছুই অগ্রাহ্য করছে।

দেবেশের জন্য বেদনা বোধ করেছে অরূপ। ওর নির্বাক দ্রষ্টার ভূমিকা দেখে রেগে গিয়ে বলেছে, অপদার্থ। উত্তেজিত হয়ে বলেছে, অমরেশের কীর্তি ও প্রমাণ-শুদ্ধ হাজির করবে শম্পার সামনে। কিন্তু দেবেশের উদাসীনতা ওকে বাধা দিয়েছে। ওর মনে হয়েছে, দেবেশ বোধ হয় আর শম্পার ব্যাপারে ইন্টারেষ্টেড নয়। শম্পা অমরেশকে ভালোবেসেছে, একথা জানবার পর থেকে দেবেশ বোধহয় নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। এমন কি, এখন যদি শম্পা ফিরে আসে। তাহলেও বোধহয় দেবেশ আর ফিরবে না।

দেবেশ যেমন নিজেকে উদাসীন রাখতে পেরেছে শম্পার ব্যাপারে, অরূপ কিন্তু তা পারে নি। ও রাগ করেছে, উত্তেজিত হয়েছে, তিক্ত চিত্তে ভেবেছে, শম্পার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করবে। কিন্তু পারে নি। শম্পা চাকরী নিয়েছে শুনে ওর প্রথমটা মনে হয়েছে, এটা একটা ন্যাকামী। কিন্তু বেশীদিন এ ধারণাকে ধরে রাখতে পারে নি। একটু একটু করে আবার সেই মমত্ববোধ ফিরে এসেছে। যে মেয়ে দুঃখে, বেদনায় ভেঙে পড়ে নি, অপরের উদারতার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে নি, তার পাশে আবার অরূপের সমস্ত সহানুভূতি গিয়ে হাজির হয়েছে। নিজের পারিবারিক প্রয়োজনে শম্পা যে অমরেশের সাহায্য না নিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছে, এতে অরূপ মনে মনে সাধুবাদ জানিয়েছে শম্পাকে। তারপর একটু একটু করে যখন শম্পা মহেশবাবুর সঙ্গে সংঘষে লিপ্ত হয়েছে, অরূপের বুকটা কেঁপে কেঁপে উঠেছে একটা অজানা আশঙ্কায়। প্রথমেই ও ভয় পেয়েছে, শম্পার চাকরীর জন্য। শম্পার চাকরী গেলে এখনই ওকে হয়তো অমরেশের মুখাপেক্ষী হতে হবে, এটা ভাবতে অরূপের ভালো লাগত না। তাই পরোক্ষ সমর্থন থাকলেও ও চেষ্টা করেছে, শম্পা যাতে এ সংঘর্ষ এড়িয়ে যায়। কিন্তু শম্পা কোনদিনই সেটা বুঝতে পারে নি। ভেবেছে, অরূপ বোধ

হয় মহেশবাবুর হয়ে ওকালতি করছে। ভাবতে পারে নি শম্পাকে পরোক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অরূপকে কি বিরাট এক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসায় তার হৃদয়ে পিতৃ-আসন মহিম-মণ্ডিত ছিল, তার থেকে মহেশবাবু আজ স্থানচ্যুত। যে পিতৃ হৃদয়ের স্নেহ-সিক্ত আশ্রয় থেকে অরূপ আপন জীবনের রস গ্রহণ করেছে, তা আজ ছিন্নমূল। নিজের হাতেই একটু একটু করে সে আশ্রয় তাকে ভেঙে ফেলতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতরে বিরাট এক শূন্যতার চেহারা দেখে ও আশঙ্কায় শিউরে উঠেছে। হৃদয়ের মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসার যে অন্তঃক্ষরণ চলতে থাকে, সেই ক্ষরিত ধারাই তো জীবনকে সরস করে তোলে, মধুর করে তোলে। সেই ধারাই যদি শুকিয়ে যায়, শ্রদ্ধা করবার, ভালোবাসবার মানুষই যদি না পাওয়া যায়, তাহলে আর জীবনের আকর্ষণ কীই বা রইল। অরূপ যেন তাই কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইছে, যাতে তার পৃথিবীর মাটির সঙ্গে যোগাযোগ অক্ষুন্ন থাকে। তাই যেন আজ শম্পাকে তার বড় বেশী প্রয়োজন। অমরেশের প্রতারণা, দেবেশের ঔদাসীন্য, মহেশবাবুর আঘাত, সব কিছুর থেকে শম্পাকে আড়াল করে ও আজ তার পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াতে চায়।

দরজার কাছে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। অরূপ তাড়াতাড়ি চিঠিটা একটা বই চাপা দিয়ে রাখল।

"একি, অন্ধকারে এমন ভূতের মতো বসে আছ কেন ?" উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা ভরে গেল। শম্পা ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দিয়েছে।

"এস।" মৃদুস্বরে বলল অরূপ।

"কাকীমা কান্নাকাটি করছিলেন।"

অরূপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"তুমি হঠাৎ মাদ্রাজে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছ কেন ?"

"সে-কথা তো আমি মাকে বলেছি। চাকরি করে আমি টাকা জমাবো। তারপর ওদেশে পাড়ি দেব।"

"তুমি যদি শুধু চাকরি করতে যেতে, তাহলে হয়তো কাকীমা এত কষ্ট পেতেন না। এতে খানিকটা তাঁর সম্মানেও ঘা লেগেছে বইকি। সারাজীবন ধরে ওঁদের একমাত্র বাসনা তোমাকে মানুষ করে তুলবেন, আর তুমি কিনা ওঁদের সাহায্যই নিতে চাওনা।"

"আমি অমানুষ হয়ে উঠিনি, শম্পা। আর সেটা ওঁদের সাহায্যেই হয়েছে। তবে এবার থেকে নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে হবে।"

"তুমি অল্পেতেই বড় বেশী উতলা হয়ে পড। কেন বলো তো?"

যন্ত্র-কণ্ঠে যেন একটু আন্তরিকতার ছোঁয়া পেল অরূপ। নিজের আবেগকে প্রশমিত করে বলল,—

"না না, তা মোটেই না। উতলা হব কেন?"

"হচ্ছ, দেখতে পাচ্ছি। লক্ষ্মীটি, কথা শোন। নাই বা গেলে মাদ্রাজে। মাসীমার কথাটা ভেবেই না হয় মতটা বদলাও।'

না, এ কণ্ঠস্বরকে অরূপ কিছুতেই যান্ত্রিক বলে মনে করতে পারছে না। এ যেন সেই অনেকদিন আগেকার পুরোনো শম্পা কথা বলছে।

"কি হল। কথা বলছ না যে। সেদিন ওরকমভাবে কথা বলেছিলাম বলে রাগ করেছ?" শম্পা সামনে এসে দাঁড়াল।

অরূপ উত্তর দিতে পারছে না। ওর গলার কাছটায় কি যেন একটা আটকে গেছে।

"আচ্ছা বাবা,মাফ চাইছি। তাহলে হবে তো। সত্যি,তুমি কি সেন্টিমেন্টাল!"

"শম্পা!"

অরূপের কণ্ঠস্বরে শম্পা বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল।

"সেন্টিমেন্ট আমাদের অনেক আঘাতকে সহ্য করবার ক্ষমতা দেয়! তার প্রমাণ বোধ হয় হাতে হাতেই পাওয়া যাবে।"

অরূপের কথা বলবার ধরনে শম্পা রীতিমত বিস্মিত হল। একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ও বলল, কী প্রমাণ?

অরূপ চেয়ার ছেড়ে উঠল। জানলার কাছে সরে এসে একটা সিগারেট ধরালো। তারপর এগিয়ে এসে বলল, "আমি দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি, শম্পা!" একটু থেমে কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, "আমি কি একটুও আশা নিয়ে যেতে পারিনা?"

"কি?"

শম্পার তীব্র কঠিন কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল অরূপ। কম্পিত কণ্ঠে বলল, "যাওয়ার আগে হয়তো আর সুযোগ পাবনা। তাই আজ বলছি, তোমার জন্য আমি অনেকদিন অপেক্ষা করে আছি, শম্পা! তুমি কি আসতে পারনা আমার জীবনে?"

"আমার অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে আমাকে করুণা করছ অরূপ? এরকমভাবে অপমান কি না করলেই হ'ত না?"

শম্পার ঋজু কঠিন কণ্ঠস্বরে অরূপ লজ্জায় অপমানে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল।

"ছি ছি, শম্পা। কী বলছ তুমি!"

"কী বলছি, তুমি বুঝতে পারছনা? অমরেশের বিয়ের চিঠি পুরোনো মাস্টারমশাই হিসেবে তোমার বাবা নিশ্চয় পেয়েছেন। ভাবছ, অমরেশ এতদিন ধরে খেলিয়ে মেয়েটাকে ডোবালো। তাই তার দুঃখে তোমার মতো উদার-হৃদয় যুবক আর স্থির থাকতে পারছে না। ধন্যবাদ! তোমার এই করুণা প্রদর্শনের জন্য অশেষ ধন্যবাদ!" বক্রোক্তিতে ভরে উঠল শম্পার কণ্ঠ, "কিন্তু চলার পথ আমার শেষ হয়নি। আচ্ছা, চলি—"

খট্ খট্ করে জুতোর আওয়াজ তুলে শম্পা বেরিয়ে গেল। স্তম্ভিত অরূপকে ঘিরে শুধু বইতে লাগল আলোর তরঙ্গ, শব্দহীন ঘরখানাতে।

১৩

"দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে"
—রবীন্দ্রনাথ

ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি সত্যিই শম্পার ওপর খুশী হয়ে উঠলেন। মেয়েটি তাঁর জীবনে মস্ত একটা সুযোগ এনে দিল পাব্লিক ওয়ার্ক করার। ডক্টর সমাজ-পতি এসেছিলেন। সামনেই গ্র্যাজুয়েট কন্‌স্টিটুয়েন্সির ইলেক্‌শান। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি চেষ্টা করলে নমিনেশান পেতে পারবেন। ডক্টর সমাজপতি চীফ্-মিনিস্টারের ঘনিষ্ঠ মহলের লোক। সুতরাং সেদিকে কোন অসুবিধে হবে না। আর গ্র্যাজুয়েট-মহলে ক্যাম্পেন্ করার পক্ষে মহেশবাবু আর মালতী রায় খুবই উপযুক্ত হবেন। দুটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হেড। কত ছাত্র-ছাত্রী আছে ওঁদের হাতে। ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি বহুপরিচিত ব্যক্তি। সুতরাং প্রচারের কোন অসুবিধে হবে না। শুধু কতকগুলো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকতে হবে। তা সে-ভার মহেশবাবু আর মালতী রায় নিয়েছেন। ওঁদের নিজের নিজের স্কুল-কমিটিতে মিঃ চ্যাটার্জিকে কো অপ্‌ট্ করে নেওয়া হবে। তবে হ্যাঁ, গার্ল্‌স্ স্কুলের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। সুতরাং মিঃ চ্যাটার্জি কয়েক হাজার টাকা ওখানে ডোনেশান দিন এইটি স্কুল-কর্তৃপক্ষের সনির্বন্ধ

অনুরোধ। তাহলেই সিঁড়িটা তৈরি হয়ে যেতে পারে। হাজার হোক, বাচ্ছা বাচ্ছা মেয়েগুলোর জীবনের একটা দায়িত্ব আছে তো!

আগাগোড়া প্রস্তাবটা যেন মিঃ চ্যাটার্জির সঙ্গেই পরামর্শ করে করা। সত্যি, এতটুকু আপত্তির কারণ নেই ' ব্যারিস্টার সাহেবের তবে আর কেন? রামকান্তবাবুকে ডেকে এনে ব্যাপারটা আপোষে মিটিয়ে ফেলা যাক। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন মেয়ের চিকিৎসার খরচ আর মামলার জন্য যা খরচ হয়েছে, সেটা পেয়ে গেলে তাঁর দিক থেকে কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

ব্যারিস্টার চ্যাটার্জির বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠে জানলার ধারের সীটটায় অলস ভঙ্গীতে বসে শম্পা তাই ভাবল, সত্যি, রামকান্তবাবুর তরফে কোন আপত্তিই আর থাকবার কথা নয়। ক্ষতিপূরণ যখন হয়ে যাচ্ছে, তখন আর শুধু মামলার ঝামেলা ভোগ করে লাভ কী। আগামীকাল সকালে রামকান্তবাবু আসছেন চ্যাটার্জির কাছে, সব মিটিয়ে ফেলতে। হেড-মিসট্রেস্ আসছেন, আসছেন তাঁর উকিল এবং মহেশবাবু। শম্পার আর ওখানে যাবার দরকার নেই। ওখানেই ঠিক হবে শম্পাদের স্কুল-কমিটির পরবর্তী মীটিং কবে বসবে। সেই মীটিং-এ ব্যারিস্টার চ্যাটার্জিকে মেম্বার করে নেওয়া হবে, এবং শম্পাকে বরখাস্তের নোটিশ দেওয়া হবে। আর তার পরের মীটিং এর জন্য দেরি করা ঠিক হবে না। পরের মীটিং-এ ব্যারিস্টার চ্যাটার্জি থাকবেন ওঁর আবার শম্পার ওপর বেশ কিছুটা স্নেহ পড়ে গিয়েছে। হাজার হোক, ওই তো সুযোগটা করে দিল। যাই হোক, শম্পাকে মান বাঁচানোর জন্য এরই মধ্যে পদত্যাগপত্রটা দিয়ে দিতে হবে। অরূপের বাড়ী গিয়ে কাকীমার সঙ্গে একবার দেখা করে, ওখানে টাইম টেব্‌লটা দেখে নিতে হবে, বহরমপুরে যাবার কোন্ গাড়ীটা সুবিধের। ওখানকার গার্ল্‌স্ স্কুল থেকে একটা ইন্‌টার্‌ভিউ পেয়েছে।

কী ক্লান্ত লাগছে আজ; মনে হচ্ছে বাড়ী গিয়ে শুয়ে পড়ে। ট্রামের লেডিজ্ সীটেই যেন ওর ঘুম নেমে আসবে।

আর একদিনের কথা মনে পড়ল শম্পার। বোধহয় মাসকয়েক আগে সেদিনও এমনি ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরছিল। সারাদিন ধরে স্কুল, কলেজ, টিউশানি, স্কুলে স্টাফ্ মীটিং, এসব সেরে বিকেলে যখন বাড়ী ফিরছিল, তখন ওর যেন মনে হচ্ছিল, পৃথিবীতে অক্সিজেন অনেক কমে গেছে। তাই যেন ও

ভালোভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। বাড়ীতে এসে ঘর অন্ধকার করে বালিশটা বুকের কাছে চেপে ধরে শুয়ে পড়েছিল ও। এমন সময় অমরেশ এলো। শম্পা শুনতে পাচ্ছিল, ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে সাধনা অমরেশকে ওর অসুস্থতার কথা বলছিলেন।

"তুমি যদি পার, দেখ বুঝিয়ে সুঝিয়ে। এত খাটুনী কি এই বয়সে সহ্য হয়। শেষকালে একটা ভারী অসুখে পড়ে গেলে, দিদিমণির কাছে মুখ দেখাব কি করে। তোমার কথা ও হয়তো শুনবে।"

কাকীমার কথাগুলো শুনতে ভারী ভালো লাগছিল শম্পার। তার স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে অমরেশের যে একটা দায়িত্ব আছে, কাকীমার মুখে একথা শুনে একটা পুলক অনুভূতিতে ভরে যাচ্ছিল ওর দেহ-মন।

অমরেশ আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করল। শম্পা ঠিক একইভাবে শুয়ে রইল। শম্পার পাশে, বিছানার ওপর এসে বসল অমরেশ। তারপর আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত রাখল। মুখটা কাণের কাছে নামিয়ে এনে মৃদুস্বরে জিগেস করল, খুব কি কষ্ট হচ্ছে শম্পা?

একটা অনাস্বাদিত পূর্ব রোমাঞ্চে, একটা অসহ্য আবেগে, শম্পার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মুখর হয়ে উঠেছিল। এই পৃথিবীতে এমন একজন মানুষ আছে যে তার সমস্ত ব্যথা-বেদনার বোঝা তুলে নিয়ে তাকে আপনার করে নিতে চায়, এই অসহ্য পুলক-অনুভূতিতে শম্পা বালিশে মুখ লুকিয়ে অনুভব করছিল। তার যেন মনে হচ্ছিল, অমরেশ আরও এগিয়ে আসুক, আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠুক। এই মোহমদির নিভৃত সন্ধ্যায় অমরেশ তাকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিক।

হঠাৎ শম্পার বুকের কাছটা কন কন করে উঠল, আজ এই ট্রামের জানলার ধারের সীটটায় বসে। প্রচুর হাওয়া আসছিল হু হু করে। তবুও শম্পার যেন মনে হচ্ছিল, আজও সেদিনকার মত বাতাসে অক্সিজেনের পরিমান কমে গেছে। সেদিন কিন্তু অমরেশ বলেছিল, চল একটু বেড়িয়ে আসি। ট্যাক্সিতে অমরেশের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে আউট্রাম ঘাটের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শম্পা কিন্তু আর অক্সিজেনের অভাব অনুভব করে নি। বরং ছোট্ট পাখির অসহায়তায় অমরেশের বুকের কাছে মুখ রেখে পরম নিশ্চিন্তে চোখ দুটো বুজিয়ে বসেছিল।

ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল শম্পা। মনের মধ্যে যেই একটু নিভৃত

অবসর রচিত হয়, কোন অলক্ষিত রন্ধ্র পথে পুরোনো স্মৃতির ছবিগুলো অমনি অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে মৃদু হেসে সামনে এসে দাঁড়ায়। শম্পা কিছুতেই ওদের দিকে ফিরে তাকাতে চায় না।

এর থেকে অনেক ভালো ছিল, কোন একটা উপলক্ষে অমরেশের সঙ্গে মতান্তর ঘটিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আচ্ছা, ও যদি আরও আগে অমরেশ বীথির সম্পর্কটা আঁচ করতে পারত, তাহলে কি ও এমনিভাবেই সব সম্পর্ক এক কথায় চুকিয়ে দিয়ে চলে আসতে পারত। না, তাহলে অমরেশের কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করত? দূর তা কখনও কেউ পারে! ইহজগতের সব কিছু জিনিসের ওপর দাবী প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ঝগড়া করা যায়। কিন্তু তোমার ভালোবাসায় আমারই দাবী, এ নিয়ে বিবাদ চলে না।

আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, অমরেশ বীথির সঙ্গেই অভিনয় করছিল। সেটা শম্পা হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না, তাই ও আর আসে নি। শম্পার কাছে কোন মুখে ও আর আসবে! কিন্তু শম্পা যদি ওকে আবার ডাক দিত, জানতে চাইত, ব্যাপারটা কি, তাহলে হয়তো সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়ে যেত। দিনের পর দিন অমরেশ অপেক্ষা করেছে। তারপর হয়তো বীথির সঙ্গে বিয়েতে মত দিয়েছে।

হাউ এ্যাবসার্ড! শম্পা ভাবল। ওকি এখনও একটা আশাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইছে। পথ চলার নতুন কোন অবলম্বন পায় নি বলেই ওকি অতীত স্মৃতির রোমন্থনে জীবনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইছে।

না, তা হয় না। অমরেশকে বিদায় দিতেই হবে। নতুন করে পথ চলা সুরু করবার আগে জীবনের এই সব রোম্যান্টিক অধ্যায়গুলি চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু থাকলই বা দু একটা রঙীন স্মৃতি। কীই বা আর ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে। বিদায়ের রেখাটি একটু যদি আবেশ রঙীন রঙেই রাঙানো থাকত, তাহলে হয়তো কত ক্লান্ত বর্ষণ অপরাহ্নে কিংবা হেমন্তের বিষন্ন মধ্যাহ্নে, হয়তো কোন এক সুদূর মফস্বলের স্কুল হস্টেলের নিভৃত পরিবেশ ঘন হয়ে আসত স্মৃতি চারণে, অনেক রূঢ় বাস্তবের গন্ধময় মুহূর্তগুলিকে অতিক্রম করে। অমরেশ যদি এসে বলত, শম্পা, আমাকে ক্ষমা করো, বীথিকে আমি কথা দিয়ে ফেলেছি, তাহলে হয়তো শম্পার প্রহরগুলি এমনিভাবে বঞ্চনার বেদনায় শূন্য হয়ে যেত না। সবায়ের কাছে স্বাভাবিকতার অভিনয় করে যেতে যেতে মনের

মধ্যে ঘনিয়ে উঠত না ক্লান্তির দুর্বিষহ বোঝা। এ বোঝা সে নামাবে কেমন করে!

সেদিন বড়মুখ করে অরূপকে বলে এসেছিল, চলার পথ তার শেষ হয় নি। কিন্তু সত্যিই কি তাই। এই প্রচণ্ড বেদনার বোঝা নিয়ে মনে হচ্ছে, পথ চলা তার শেষ হয়ে গেছে। নিদারুণ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়বার আগে কোনরকমে বাকী পথটুকু শেষ করে দিতে চায় ও। এই সময়ে কি কেউ একজন বন্ধুর মত এগিয়ে এসে হাত ধরতে পারে না। নাই বা রইল দয়িত, যার বাঁশীর আহ্বানে জীবনকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় যৌবনের ভরা নদীতে। বরং বন্ধুর পথে দুর্যোগের মুহূর্তগুলি পার হয়ে যাওয়া যায়, এমন একটি বন্ধু মেলে না? অরূপ ওকে করুণা করতে এসেছিল। এসেছিল কি? হয়তো ওকে ওরকমভাবে আঘাত দেওয়া ঠিক হয় নি। হয়তো অসহায় মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ঐভাবেই প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। অরূপের সঙ্গে যদি আজ আবার দেখা হয়? ও যদি জিগেস করে, চলার পথ কি তোমার এখনও শেষ হয় নি! কি জবাব দেবে শম্পা? মনে মনে যে বিরাট একটা কাণ্ড ও কর্মজগতে ঘটাতে চাইছিল, ফাটা বেলুনের মতো সেটা চুপসে গেছে। মহেশবাবুর সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে শম্পা একটা বাঁচবার অবলম্বন খুঁজছিল। একটা কিছুকে আঁকড়ে ধরে চাইছিল, শূন্যতাকে পরিহার করতে। সেই অবলম্বনটুকুও ওর আর রইল না। আগে ভাবত, মহেশবাবুর সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়, কিভাবে কথা বলবে। আজ যেন আর কোন অস্বস্তি বা সঙ্কোচের কথা মনেই হয় না। শুধু কষ্ট হয় কাকীমার জন্য। কাকীমা বোধহয় সব ব্যাপারটাই জেনে গেছেন। কাকেও কিছু বলতে পারছেন না। শুধু যন্ত্রণার নীল বিষে জারিত হচ্ছেন। 'যে পথ দিয়া চলিয়া যাব সবারে যাব তুষি'—সেই ব্রত বহন করে, সবায়ের মুখে হাসি ফোটাতে ফোটাতে একদিন এই মাতৃসমা কাকীমার জীবনদীপ নির্বাপিত হবে। শম্পা সেদিন থাকবে দূরে। অরূপের চিঠিতে হয়তো খবর পাবে। অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা ভক্তিকে একটি ফোঁটা চোখের জলে প্রতিবিম্বিত করবে সেদিন। মনে মনে বলবে, পথের সঞ্চয় আমার কম নয়। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শম্পার চোখ দুটো সজল হয়ে আসে। ফাটা বেলুনের ছেঁড়া জায়গাটা হাত দিয়ে টিপে ধরে, ফোলাতে চেষ্টা করে শম্পা।

৳

আজ অনেকদিন বাদে মহেশবাবু একটু নিশ্চিন্তমনে দাড়ি কামাতে বসে-

ছিলেন। অমরেশের বিয়েতে যাবেন। প্রমীলা খাটের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছেন। সত্যি, ওর যে কী হল! কোন অসুখ-বিসুখ নেই। হঠাৎ শরীরটা এরকম ভেঙে গেল। না, অরূপের হাতে আর ফেলে রাখা ঠিক না। বড় ডাক্তারকে দেখাতে হবে। অরূপ এ-ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে একটা স্যুটকেস বার করে নিয়ে চলে গেল। শ্রীমানকে ক'দিন যেন গম্ভীর-গম্ভীর দেখাচ্ছে। কী হল! প্রমীলার সঙ্গে রাগারাগি করে কি বাইরে যাচ্ছে নাকি! রাগারাগি হবেই-বা কী নিয়ে? বিয়ের ব্যাপার নিয়ে নিশ্চয়ই। ভালো কথা মনে পড়েছে তো! সমাজপতি যে 'সম্বন্ধ'টা দিয়েছিল, তারা সেই সম্বন্ধে খোঁজ-খবর করতে এসেছিল ওর কাছে। মহেশকে জানাতে হবে, ওরা রাজী কিনা। ঠিক বটে। নানা ঝামেলায় কথাটা মনে ছিল না। কথাটা প্রমীলাকে জিগেস করা উচিত। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, প্রমীলা গম্ভীরভাবে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে। সোজাসুজি ও-কথাটা জানাবার দরকার নেই। বরং অরূপের খবরটা আগে নেওয়া যাক।

"শ্রীমান দেখছি স্যুটকেস গোছাচ্ছেন। বাবু চললেন কোথায়?"

"মাদ্রাজে।" ওপাশ ফিরে শুয়ে-শুয়েই জবাব দিলেন প্রমীলা।

"হঠাৎ?" ব্লেড-টা মুছতে মুছতে জিগেস করলেন মহেশ।

"মাদ্রাজে চাকরি পেয়েছে। সেখানে চাকরি করবে।"

ব্লেড-টা খাপের মধ্যে ভরতে গিয়ে থেমে গেলেন মহেশ। "তার মানে?"

"চাকরি করার আবার মানে কী?" উদাসীন কণ্ঠে ওপাশ ফিরেই জবাব দিলেন প্রমীলা।

ব্লেড-টা সাবধানে খাপের মধ্যে পুরে ফেললেন মহেশ। "চাকরি কেন সে করতে যাচ্ছে, সেটাই আমি জানতে চাই।" তীব্র-স্বরে বলে উঠলেন মহেশ।

"চেঁচিওনা। আমার মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।" শান্ত স্বরে বললেন প্রমীলা, "অরূপ তো পাশের ঘরেই রয়েছে। ওকে ডেকেই জিগেস করো।"

বিস্মিত হয়ে গেলেন মহেশ। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য-জীবনে প্রমীলাকে এরকম ভাবে কথা বলতে কখনও তো শোনেননি। তাহলে কি ওর শরীরটা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে? আর অরূপ এসময় মাকে ফেলে রেখে বাইরে চলে যাচ্ছে। আচ্ছা ছেলে তো? হঠাৎ কিরকম যেন অসহায় বোধ করলেন মহেশ।

অরূপ ঘরে ঢুকে খাটের তলা থেকে হোল্ডল্-টা টেনে বার করল। তারপর সেটা হাতে করে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল। মহেশবাবু বললেন, "দাঁড়াও।"

অরূপ ফিরে দাঁড়াল।

"তুমি নাকি মাদ্রাজে চাকরি নিয়ে চলে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ।"

"কারণ ?"

"খুবই সহজ। চিরকাল তো আপনার অন্ন ধ্বংস করবনা। তাই এবার নিজের পায়ে দাঁড়াব, ঠিক করলাম।"

"বটে! সেটা আরও দু'চার বছর আগে করলে কী হ'ত ?"

"দু'চার বছর আগে তো আমাকে নেহাতই ছেলেমানুষ করে রেখেছিলেন। এতটা বোধশক্তি আসেনি।"

"অ! তা এখন কি বুঝলে তুমি ?"

"বুঝলাম, একটা ছেলেকে ডাক্তার বানাতে গিয়ে আপনার ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ছে।"

"তা আর না-হয় দু'একবছর চাপটা পড়ত। বিলেত ঘুরে এসে, তুমি না-হয় আমাকে সে-চাপ থেকে একেবারে মুক্ত করতে।"

"হয়তো তাই করতুম। যদি দেখতুম সে-চাপ সহ্য করে আপনি সোজা হয়ে আছেন।"

"কেন, তুমি কি ভেবেছ, আমি নুয়ে পড়েছি ? জান, এখনও আমি—"

"জানি। একজন নিরীহ সহকর্মীকে পেছন থেকে ফেলে দিয়ে, তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে শক্তির দম্ভ করা যেতে পারে। তবে সেটা মানুষ হিসেবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নয়।"

"কী! কি বলতে চাও তুমি ?"

"যখন একলা হবেন, তখন আমার কথাটা ভেবে দেখবেন। আমার পক্ষে আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। কাল দুপুরে মাদ্রাজ মেলে আমি চলে যাচ্ছি।"

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অরূপ।

প্রমীলা ঠিক একই রকম ভাবে শুয়ে রইলেন। আর এই প্রথম যেন মহেশবাবুর মনে হল, তাঁর চালে ভুল হয়ে গেছে। শক্ত খুঁটির ওপর সংসারটাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি দেখলেন, সংসার বস্তুটাই তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

স্যুটকেস গোছানো হয়ে গেছে। হোল্ডল্ বাঁধা শেষ। টুকিটাকি জিনিস-

গুলো হ্যাণ্ড্-ব্যাগ্‌টায় যাবে। গাড়ীতে পড়বার জন্য একটা পত্রিকা পুরে নিল ব্যাগ্‌টায় অরূপ। তারপর জানলার কাছে সরে এসে একটা সিগারেট ধরাল।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল শম্পা। ও সোজা দেবেশের কাছ থেকে এখানে আসছে। কলকাতা ছাড়বার আগে ও পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে নিতে চায়। দেবেশ ওর সঙ্গে কথা বলল যেন কত সতর্কতার সঙ্গে, হিসেব করে, মেপে মেপে। পাছে অতর্কিতে শম্পাকে আঘাত দিয়ে ফেলে, তাই হয়তো এত সাবধানতা। মনে মনে হাসল শম্পা। দেবেশ ঠিক অরূপের বিপরীত মেরু। কিন্তু দুজনের কেউই শম্পাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারল না। ওর জীবনের গত দুর্ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে বন্ধুত্বের পুরোনো সম্পর্ক দিয়ে ওকে গ্রহণ করা দুজনের পক্ষেই সম্ভব হল না।

চলে আসবার সময়ে দেবেশ বলল, "শম্পা, তোমাকে একটা কথা বলব। তোমার সঙ্গে অরূপের দেখা হবে?"

"হবে হয়তো। কেন বল তো?"

"ওকে একটা অনুরোধ করতে পারবে?

"কি অনুরোধ?"

"ওকে কলকাতায় থাকতে রাজী করাতে হবে। সেটাই ওর পক্ষে ভালো।"

"কিন্তু তা কি করে হবে। ও যে বাইরে চাকরী নিয়েছে।"

"ও কলকাতাতেও একটা চাকরী পেয়েছে। শুধু কলকাতার বাইরে যাবে বলে এ চাকরীটা নেয় নি।"

"তার কারণ?"

"কারণটা তুমি ওর মুখেই শুন। আমার বক্তব্য, ও যদি কলকাতায় থাকে, তাহলে সব দিক থেকে ভালো হয়।"

"তুমিও তো ওকে বলতে পারতে।"

"বলেছিলাম। আমার কথায় ও কান দেয় নি। আর তাছাড়া—"

শম্পা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

"কথাটা তুমি বললেই ভালো দেখায়।"

"কেন বল তো?"

শম্পার কণ্ঠস্বর ঈষৎ যেন কঠিন হয়ে পড়ল।

দেবেশ ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "অরূপের আন্তরিকতায় তুমি সন্দেহ কোরো না শম্পা।"

"তোমার কি তাই মনে হয় যে আমি অরূপের আন্তরিকতায় সন্দেহ করেছি।"

"না, না, তা মোটেই নয়।" দেবেশ ব্যস্ত ভাবে বলে উঠল, "তবে অরূপ হয়তো তাই ভাবছে।"

শম্পা কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর বলল, "বেশ, আমি বলব একবার অরূপকে।"

তারপর আবার চুপচাপ। একটার পর একটা নীরব মুহূর্তগুলি কাটতে লাগল। দুজনের কেউই যেন আর কথা খুঁজে পেল না। শম্পার মনে পড়ল, আগে কত দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওরা তিনজনে এই ঘরে গল্প করেছে, আড্ডা দিয়েছে, গান গেয়েছে। কথার কথনও অভাব হয় নি। সেদিনের মুহূর্তগুলি ছিল রঙীন প্রজাপতির মত, হালকা পাখায় ভর দিয়ে দ্রুত উড়ে যেত। সে জীবনটা বোধ হয় আর ফিরে আসবে না। যখন যেখানেই থাকুক না কেন, পূব দিগন্তে যখনই বর্ষার নবীন মেঘ ঘনিয়ে আসবে, ওর মনে পড়ে যাবে, খবরের কাগজের ওপর রাখা মুড়ি-চিনেবাদাম খেতে খেতে বর্ষা উৎসবের গান নির্বাচনের কথা। মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠবে, 'বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এলো আমার মনে।' সেদিনও কি আষাঢ় এমনি করেই আসবে! মেঘের ঘনঘটা চিরে বিদ্যুতের রতন সাজে দশদিক চমকিত করে, রাজ-সমারোহের বর্ষা! মনের ঈশাণ কোণে গুমরে গুমরে উঠবে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ, বর্ষণের আশু প্রতীক্ষায়।

স্মৃতির অবগাহনে মুহূর্তগুলো কেটে যায়। এক সময়ে শম্পা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে, 'আজ চলি।'

দেবেশ ওকে এগিয়ে দেবার জন্য উঠে পড়ে বলে, 'এসো।'

আর কোনো কথা হয় না।

শম্পা নীরবে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

পথ চলতে চলতে দেবেশের কথাগুলো মনের মধ্যে গুঞ্জন তোলে। 'অরূপের আন্তরিকতায় তুমি সন্দেহ কোরো না শম্পা।' কেন? একথা কেন? তবে কি সেদিনের কথায় অরূপ তাই মনে করেছে? ছি, ছি, ওর এ ভুল ধারণা ভেঙে দিতে হবে। সহজ বন্ধুত্বের স[illegible]র্ক কোনদিন ফাটল ধরবার নয়। আর আজ যে শম্পার বিশেষ প্রয়োজন একজন বন্ধুর।

হাঁটতে হাঁটতে শম্পা সোজা এসে পৌঁছল অরূপের ঘরে। অরূপ ফিরে তাকাল, কোন কথা বলল না। শম্পাব চোখে-মুখে একটা ক্লান্তির ছাপ। সে মৃদু হেসে বলল, "তোমার ঘরে আসতে পারি অরূপ?"

"যাবার আগে হঠাৎ করুণা দেখাচ্ছ?"

শম্পা একটু ম্লান হাসল।

অরূপ বলল "এস।"

শম্পা ঘরে এসে বসল।

"রামকান্তবাবুর মেয়ের ব্যাপারে তুমি তো নিরপেক্ষ থাকলেই পারতে। দেখলে তো, শেষে ওরা কিরকম সরে দাঁড়াল।"

"ওই ব্যাপারে তোমার বাবাও তো নিরপেক্ষ হয়ে থাকলে পারতেন। অনর্থক নোংরামিগুলো ঢাকতে যাবার কী দরকার ছিল।" নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল শম্পা।

একটু চুপ করে থেকে অরূপ হেসে বলল, "তুমি বোধহয় আঘাত না দিয়ে কথা বলতেই জাননা, তাই না শম্পা।"

লজ্জিত হল শম্পা। সত্যি, এ-কথাগুলো আজ আর অরূপকে বলার কোন মানে হয়না। আজ ও এ-ধরনের খোঁচার বাইরে চলে গেছে। শম্পা নিজে শুধু একটা অক্ষমতার আক্রোশে জ্বলছে বলে মাঝে মাঝে নিজের অজ্ঞাতেই খোঁচাটা বেরিয়ে যাচ্ছে।

"যাক্, ওসব ব্যাপার যেতে দাও। আমি কিছু মনে কবিনি। শুধু একটা কথা তোমার চাকরিটা বোধহয় আর থাকবেনা। সুতরাং "

"আমি রিজাইন করে দিয়েছি।"

"ও।" একটু চুপ করে রইল অরূপ। "তাহলে এবার?"

"বহরমপুর থেকে একটা ইন্টারভিউ পেয়েছি।"

"কবে যাচ্ছ?"

"আজ রাত্রে। লালগোলা প্যাসেঞ্জারে। তুমি ?"

"আজ দুপুরে। মাদ্রাজ মেলে।"

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

"তুমি তো কলকাতায় থাকবার সুযোগ পেয়েছিলে—কিন্তু থাকলে না কেন ?"

অরূপ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

"তুমি তো কলকাতায় একটা চাকরি পেয়েছিলে।"

"কলকাতায় চাকরি ?" অরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল শম্পার দিকে।

"দেবেশ বলছিল।"

"ননসেন্স্ ! কথা রাখতে জানেনা বাস্কেল্টা।" বিরক্ত এবং কিছুটা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল অরূপ।

"তা না-জানুক। কিন্তু ঘটনাটা তো সত্যি।" নরম গলায় বলল শম্পা, "তুমি ইচ্ছে করলেই থেকে যেতে পারতে।"

"অবান্তর প্রশ্ন।"

একটু আহত হল শম্পা। সে-ভাবটাকে দমন করে বলল, "সে-কথা সত্যি। তোমার সব কথা নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা করা আমার অবশ্য ঠিক হচ্ছিল না। শুধু কাকীমার কথাটা ভেবেই আমি বলছিলাম। তুমি কিছু মনে কারো না।"

"তুমি কী নিষ্ঠুর শম্পা ! পাথর দিয়েও বোধহয় তোমার মনের তুলনা হয়না।"

ত্রস্ত কণ্ঠে শম্পা বলল, "কেন ?"

"আমার সব কথা নিয়ে সোজাসুজি আলোচনা করার অধিকার, নিজেই তোমায় আমি উপযাচক হয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কঠিন হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েই তুমি ক্ষান্ত হওনি। উল্টে খোঁচা দিচ্ছ, তোমার সঙ্গে আমার সহজ বন্ধুত্বের দাবিটুকুও নেই বলে। শম্পা, তোমার এ-কথার আমি কী উত্তর দেব বলতে পার ?"

আবেগে থমথম করতে লাগল অরূপের কণ্ঠ।

তারপর ওর কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে রইল শম্পা। অনেক কষ্টে বলল, "তুমি বললে, অবান্তর প্রশ্ন। তাই আমি

"বলব না ?"

অধৈর্য কণ্ঠস্বরে অরূপ উত্তর দিল, "আমার মায়ের কথা ভেবে তুমি প্রশ্নটা করলে, আমি কেন কলকাতায় থাকলাম না। আমার কথাটা ভেবে কেন তুমি নিজেই উত্তরটা দিলে না ? একটি মেয়ে তার পথ চলা সবে শুরু করেছে। জীবন তার কাছে সত্য, পৃথিবী তার কাছে সুন্দর। সেই মেয়েটির জীবনের সমস্ত সুষমাকে বাবা জীবনের শুরুতেই তছনছ করে দিলেন। তুমি আত্মীয়স্বজন ছেড়ে চললে বাইরে, শুধু জীবন-সংগ্রামের তাগিদে। আর আমি বাবার জমানো পয়সায় তোফা আরামে দিন কাটাব, বাপ-মায়ের আঁচলের তলায় থেকে ?"

প্রাণপণে মনের সমস্ত জোরটুকু কণ্ঠে সংগ্রহ করে শম্পা বলল, "অরূপ, তুমি তুমি—সেন্টিমেন্টাল্ হয়ে পড়ছ।"

"না।"

তীব্রস্বরে বাধা দিল অরূপ, "আমি হঠাৎ মোটেই সেন্টিমেন্টাল্ হয়ে পড়িনি। বরাবরই আমি সেন্টিমেন্টাল্, হ্যাঁ, সেন্টিমেন্টাল্। আমি মহাপুরুষ নই—সাধারণ মানুষ—জীবনের সমস্ত সাধারণ আবেগই আমার আছে। এবং তাই নিয়েই আমি চিরটা কাল কাটাব তা তোমরা আমায় যতই ঠাট্টা করোনা কেন।"

শম্পা অনুনয়ের দৃষ্টিতে একবার অরূপের দিকে তাকাল। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে অরূপ আবার বলল, "সাধারণ বন্ধুত্বের দাবিটুকুও অন্তত তোমার কাছে আশা করেছিলাম, শম্পা। নাই-বা পারলে আমায় ভালবাসতে। মফস্বলের কোন এক মেয়েদের স্কুলে অমরেশের স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবনটুকু হয়তো তুমি কাটিয়ে দেবে ? আর আমি হয়তো পৃথিবীর আর-এক প্রান্তে বসে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান লেখার ফাঁকে ফাঁকে ভাববো, কেন আমি অমরেশের আগে তোমার জীবনে এলাম না। কিন্তু এই বিচ্ছেদের রেখাটুকু না হয় একটু বন্ধুত্বের ভাবাবেগে রঙীন হয়েই রইল। শম্পা, তুমি কি শুধু একটা আইডিয়া—তুমি কি নারী নও ?"

আশ্চর্য ! অরূপ এসব কি বলছে ! এ যে তারই কথা। তারই জীবনের যন্ত্রণার ভাষারূপ ! সে যা চাইছে, অরূপও ঠিক তাই চাইছে। তাহলে দেনা-পাওনার গরমিলটা তবুও রয়ে যাচ্ছে কেন ? তবে কি অরূপের দাবীটা

আরও একটু বেশী যা নিঃশেষিত শম্পার পক্ষে কোনভাবেই মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।

বেদনার হাসি হেসে অরূপ ওর কথা শেষ করল। তারপর জানলার কাছে উঠে গিয়ে সিগারেটটায় টান দিতে গিয়ে দেখল, সেটা নিভে গেছে। জানলা গলিয়ে সেটা ফেলে দিল। গরাদ ধরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ফিরে এসে দেখল, দু'হাতের মধ্যে মাথা রেখে শম্পা মুখ নীচু করে বসে আছে।

শম্পা বুঝল, অরূপ ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনের সমস্ত আহ্বান নিয়ে। পথ চলার নতুন লগ্নে অরূপ ওকে ডাকছে। সুদূর পথের আলোছায়া আবার কোন এক মায়াপুরী রচনা করছে। ভালো লাগছে আবার নতুন করে সব কিছু সুরু করতে। মনে হচ্ছে জীবন বিচিত্র, অনন্ত সম্পদে ভরা। সে সম্পদ কোনদিন ফুরোয় না।

থাক না পেছনে পড়ে অতীতের যত গ্লানি। রিক্ত স্মৃতির ভার থাক না পড়ে পথের পাশে বোঝার মত। অন্তর যদি আবার কাণায় কাণায় ভরে ওঠে ক্ষতি কি দুপাশের তটভূমি আবার সবুজ করে দিতে।

"শম্পা!" মৃদু কণ্ঠে অরূপ ডাকল।

মুখ তুলল শম্পা। গভীর চোখ-দুটো ওর কানায়-কানায় ভরা জলে টলটল করছে।

"শম্পা—"কম্পিত কণ্ঠে ডাকল অরূপ।

শম্পা ওর হাত-দুটো ধরে বলল, "আর কী শাস্তি দেবে দাও!" বলে একটু হাসবার চেষ্টা করল। মুক্তোর মতো জলবিন্দুগুলি শিশির-ভেজা শিউলীর মতো টপ্‌টপ্‌ করে ওর শুভ্র গালের ওপর ঝরে পড়ল। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অরূপ।

"বলো কি বলবে।" হাসল শম্পা।

"আজ আর তোমায় কিচ্ছু বলব না। সুস্থ, সুন্দর জীবনবোধে দীক্ষা তোমার। বিশ্বাস করি, হারবে না তুমি রিক্ততার সংগ্রামে।"

"কিন্তু আজ যে তোমায় শুধু হাতে ফিরিয়ে দিলাম অরূপ।"